

প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

প্রাথমিক

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য, এম. এ., বি. টি., এম. এ. (এড.),
এম. এ. (লণ্ডন), টি ডি. (লণ্ডন),
ডিপ্লোমা ইন মণ্টেসরি ট্রেনিং (লণ্ডন)
অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ

প্র কা শ ভ ব ন। ক লি কা তা—১২

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক—মনীষী বসু
প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

চার টাকা

উৎসর্গ-পত্র

যাঁর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে ধন্য হয়ে এই কাজে হাত দিয়েছি, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্রের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট হল।

ভূমিকা

বিচিত্র এই জগৎ, তার থেকে বিচিত্র মানুষের মন। তাই সেই মনের কথা লিখব বলে অনেক দিন মনে করেছি। মনের কথার এই আলোচনাটি হল প্রথম পর্যায়ের। যাঁরা মনোবিজ্ঞানে অনুরাগী যাঁরা মনের খবর জানতে চান তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এই আয়োজন।

আজ মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। মনের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা চলেছে দিকে দিকে। তাই কৈশোর থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা সেই মনের কথা বুঝতে শেখে, সে দিকে আজ দৃষ্টি দেওয়ার অবসর হয়েছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে কিশোরদের সেই প্রয়োজন মেটে এই গ্রন্থখানি সে দিকেও সজাগ।

কিভাবে শিক্ষার্থীকে শৈশব থেকেই নির্দেশ দেওয়া যায়, গ্রন্থখানির মধ্যে সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আছে। যাতে মনের কথা সকলের মনের কথা হয়ে দাঁড়ায় সেজন্যে ভাষাকে যতদূর সম্ভব সহজ ও সরস করবার প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি জনসাধারণ বিশেষ করে কিশোরদের হাতে এই নূতন ধরনের বইখানি তুলে দেওয়া সার্থক হবে। ইতি

গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইখানির প্রণয়ন ও প্রকাশনের ব্যাপারে আমি অনেকের কাছেই ঋণী। তাঁদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় প্রকাশক বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অগ্রজোপম সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর কাছে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাদের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ না পেলে মনের কথা মনেই থেকে যেত। গ্রন্থখানির পরিকল্পনায় আমি আমার ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী দেবী ও সংখ্যাবিজ্ঞান অংশটির প্রণয়নে আমি প্রবীণ শিক্ষক শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের শুভেচ্ছা ও প্রযত্ন গ্রন্থখানির আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর করেছে। ইতি

গ্রন্থকার

গোড়ার কথা

আদিম যুগে মানুষ যে সব বিষয়ের কার্য-কারণ নির্ণয় করতে পারত না সেগুলিকে তারা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে আখ্যা দিত। তাই তাদের মতে গ্রহণ ছিল দৈত্য, বজ্র ছিল বরুণ দেবতার দণ্ড। এমনকি মহামারীর পেছনেও থাকত ছোটখাট দেবতাদের কারসাজি। এইভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তারা সমস্ত ঘটনার বিচার করত। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী তখন আধ্যাত্মিকতার রহস্যে আচ্ছন্ন থাকত।

বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক বিচারের প্রথম সূত্রপাত হয় কঠোপনিষদে। জীবনের রহস্য নিয়ে যম ও নচিকেতার মধ্যে বিচারসম আলোচনাই এর নিদর্শন। এই বিচারসম দৃষ্টিভঙ্গী আমরা কপিলের সাংখ্যের মধ্যে পাই। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ কাহিনীগুলির যদিও অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ আছে তবুও সেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব নেই। জড়বাদী লোকায়ত দার্শনিক চার্বাক ও তাঁর আলোচনায় কোথাও বিচার-সমতাকে হারান নি। কিন্তু সেই যুগে এই ধরনের আলোকপ্রাপ্ত দার্শনিকের সংখ্যা খুব কম ছিল। আর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকেও তার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশে পাশেই চলেছিল অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা।

চীনদেশে কনফুসিয়সও এই অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা পরিহার করে বিচারসম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টজন্মের ৩০০ বছর আগে গ্রীসদেশে Thales প্রথম অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসী হয়ে প্রাকৃতিক ঘটনার বিচারসম ব্যাখ্যা দিলেন। এর পর আসেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস। তিনি প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়ের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি সক্রেটিসের পদ্ধতি নামে পরিচিত। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো বলেন যে সংস্কারযুক্ত জ্ঞান প্রত্যেককে দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে পারে। তবে তিনি Concrete-এর থেকে Abstract-এরই বেশী ভক্ত ছিলেন। অ্যারিস্টটল অবরোহী ও আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়ের ব্যাখ্যা

করলেন। অবরোহী পদ্ধতিতে একটা সাধারণ বিষয় ধরে নিয়ে তার থেকে বিশেষে অগ্রসর হতে হয়। আরোহী পদ্ধতিতে বিশেষ থেকে সাধারণে যাওয়া হয়।

প্রকৃত দার্শনিক যুক্তিবিচারের শুরু করেন রেনেসাঁ যুগে I. L. Rao. তাঁর পদ্ধতিও ছিল আরোহী। কোন সত্য প্রতিষ্ঠার আগে তিনি সে সম্বন্ধে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তবে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতেন।

এই সব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার কেবল মাত্র জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মনোবিজ্ঞানের আলোচনাতেও প্রসারিত ছিল। জন লক (১৬৩২-৭৪) অনুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার সপক্ষে বলেন।

আধুনিক যুগের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তক হলেন রুশো। পেস্টালজি, হারবার্ট ও ফ্রোবেল সেই ধারারই বাহক। তারপর শিক্ষাদর্শন আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। একে একে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জন্ম হল।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ তা কিভাবে পরিণতি লাভ করেছে তা আলোচনা করবার মত।

মনোবিজ্ঞান ও তার ক্রমবিকাশ

জড়-জগতের সঙ্গে মনোজগতের পার্থক্য স্পষ্ট মানুষের প্রাণ আছে, আছে চেতনা, প্রবৃত্তি ও অনুভূতি। তার যে মন আছে, সে মন বলতে কি বোঝায়? এই হল প্রশ্ন। অনেকদিন ধরে এই নিয়ে আলোচনা চলেছে। গ্রীসের অনেক মনীষী মনের স্বরূপ নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ একে বলেছেন জ্যোতির্ময় সত্তা, কেউ বা আত্মা। আবার প্লেটো আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে রহস্যময় হলেও আত্মা বুদ্ধিগ্রাহ্য। তাঁরা দার্শনিক ব্যাখ্যাই খুঁজেছেন ও তা দিয়ে মনকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

অ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে মনকে বিশ্লেষণ করলেন। মনকে বুঝতে হলে যে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন সেদিকে

তিনি প্রথম নির্দেশ দিলেন। কারণ মনকে তিনি কোন দ্রব্য হিসেবে দেখেন নি, দেখেছেন কয়েকটি প্রক্রিয়ার সমষ্টি হিসেবে। কিন্তু এখানেও মীমাংসা হল না। নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলতে থাকল। মধ্যযুগেও তাই মনের বাস্তব পরিচয় পাবার চেষ্টা হল না—কেবল দার্শনিক আলোচনাই হল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় আত্মার ব্যাখ্যার অবসান ঘটল। ডেকার্টে শুরু করলেন তাঁর বিচার বিশ্লেষণ এক বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে। তিনি আত্মাকে অস্বীকার করলেন না। তিনি স্বীকার করলেন জন্মগত সংস্কারের মূল্যকে—আর মেনে নিলেন মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে। এবার মনোবিজ্ঞান নূতন মর্যাদা পেল, কারণ মনোবিজ্ঞানকে মন সম্পর্কে আলোচনা বলে মেনে নেওয়া হল। তাঁর মতে বুদ্ধি, ইচ্ছা মনেরই বিচিত্র প্রকাশ। এই মনের প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরার ফলে মনকে একটি জটিল যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হল।

ডেকার্টের পদ্ধতি ছিল অবরোহানুমান (deduction)। তারপর এলেন অনেক মনীষী তাঁদের বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে। বেকন (Bacon) ও হবস্ (Hobbes) প্রচার করলেন তাঁদের আরোহনুমান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে (Method of Induction)। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির সার্থকতা প্রতিপন্ন হল। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরূপ বুঝবার আগ্রহ দেখা দিল। লকের (Locke) মতে মানুষের মনে জন্মসময়ে কোন ছাপ থাকে না—ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তিলে তিলে অভিজ্ঞতা জমা হতে থাকে। ডেকার্টের সংস্কারবাদকে খণ্ডন করে তিনি বললেন যে কোন জন্মার্জিত সংস্কার নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে না।

এই মতবাদের নাম দেওয়া হল অভিজ্ঞতাবাদ। এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা মনের ভিন্ন ভিন্ন চেতন-প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি ও সম্পর্ক নির্ণয়ের ওপর জোর দিয়ে বললেন যে এই চেতন-প্রক্রিয়ার সম্যক আলোচনা হল মনোবিজ্ঞানের কাজ (Psychology as the science of consciousness).

এর পরে কাণ্টের আবির্ভাব। তিনি মনের প্রক্রিয়াকে মেনে নিলেন ও তাদের জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন। মনের ক্রিয়া সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত দিলেন ও মনের গতিকে স্বীকার করলেন। মনোবিজ্ঞানের এই গতির স্পষ্ট রূপ হার্টেলের অনুষঙ্গ মতবাদে দেখা যায়।

এই মতবাদ অনুযায়ী মন কয়েকটি মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র। ক্রমশঃ মনোবিজ্ঞান যতই পরীক্ষামূলক ও ব্যবহারিক হতে লাগল ততই দর্শনশাস্ত্র থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। নানা পরীক্ষা শুরু হল চেতন-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান চেতন-প্রক্রিয়া ছেড়ে আচরণ-বাদে এসে পৌছল। একদিকে ব্যবহারবাদের অনুগামী ওয়াটসন অন্যদিকে মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্রয়েড প্রচার করলেন নূতন তথ্য।

ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীদের মতে মানুষের আচরণের বৈষম্যের কারণ অবদমন। তাঁদের এই মতে মানুষ যাতে আপন ইচ্ছার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করতে বাধা না পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাঁর মতে মানুষের সমস্ত রকমের কাজের প্রাণশক্তি হল (Id.) ইদ্। আর একজন অনুগামী অ্যাডলার, পরে যিনি ভিন্নমতাবলম্বী হন। তিনি বলেন, মানুষের আচরণ-বৈষম্যের মূলে আছে তার হীনম্মন্যতাবোধ। Jung-এর মতে মানুষের মনে নানা রকমের জটের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে তিনি অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী এই দুইভাগের সৃষ্টি করেছেন। এদের দুই দলের জন্য পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন।

বিংশ শতকে মনোবিজ্ঞানের ওপরে অনেক পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে স্নায়ু-সংক্রান্ত বিষয়ে vision-এর ক্ষেত্রে এবং motor areaর ওপর পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য।

তারপর গেসটাণ্ট মনোবিজ্ঞান শেখার ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তাঁরা বলেন আমাদের অভিজ্ঞতার সম্মিলিত রূপ আমাদের নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞানী কোহলা ও কফকা গেসটাণ্ট মতবাদের বাহক। তারা জীবজন্তুর ব্যবহারের নানা রকম পরীক্ষা করেছেন।

গেসটাল্ট কথার অর্থ আকার। মন অনুভূতিগুলিকে একত্রিত করে একটা সমগ্র রূপ দেয়। মনের কাজের পরিণতি থাকে। এই পরিণতি লাভ না হলে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি হয়।

দুজনেরই প্রতিপাদ্য হল মনোবিজ্ঞান শুধু শরীর-বিদ্যাই নয়। মানুষের ব্যবহারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সব সময় সম্ভবপর হতে পারে না। তবে ওয়াটসন মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দশন বর্জনের পক্ষপাতী। তাঁর মতে মনোবিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে হলে ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করতে হবে। উডওয়ার্থও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি মনোবিজ্ঞানকে "ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সম্যক আলোচনা" বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে ক্রিয়া বলতে তিনি শারীরিক ও মানসিক সবরকম ক্রিয়ার কথাই উল্লেখ ক'রেছেন। ওয়াটসন বললেন ব্যবহারের মাধ্যমেই মনের পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ আচরণই হল মনস্তত্ত্বের বস্তুগত ভিত্তি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ওপর নির্ভর করলে মনোবিজ্ঞানের কোন বাস্তব ভিত্তিই থাকবে না।

এর পর ব্যবহারবাদী বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ত্রুটিমুক্ত হলেও ব্যবহারবাদকে আজকের মনস্তাত্ত্বিকদের অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু খণ্ড খণ্ড আচরণকে ভিত্তি করে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া কঠিন। কেবল তাই নয়, চেতন-ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে বোধ হয় মনের সব পরিচয় পাওয়া যায় না। অবচেতন মনের দিকেও তাই ফিরে তাকাবার যে সার্থকতা আছে একথা ফ্রয়েড ঘোষণা করলেন।

বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানের-ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, এই আচরণের ওপর ভিত্তি করে। ক্যাটেল (Cattel), টিচনার (Titchner), ম্যাগডুগাল (Mc Dougall), থর্নডাইক (Thorndike), স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) উড্ওয়ার্থ (Woodworth) সকলেই কমবেশী ব্যবহার-বাদকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

তাই মনোবিজ্ঞানের ধারার মধ্যে একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রথম সংজ্ঞা ছিল আত্মার বিশ্লেষণ, তারপর দৃষ্টি পড়ল মনের স্বরূপ নির্ণয়ের দিকে। একে একে চেতন-প্রক্রিয়ার ওপর ঝোঁক পড়ল, পরে ব্যবহারবাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

আজ একদল মনোবিজ্ঞানী আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। কেবল ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানুষের মনের পরিচয় পাবার চেষ্টা করা তাঁদের মতে ঠিক নয়। তাই তাঁরা আজ অন্তঃবিশ্লেষণের প্রয়োজনকে স্বীকার করছেন। তাই সমগ্রবাদই আজ নতুনভাবে মনস্তাত্ত্বিকদের মনকে নাড়া দিয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

মনোবিজ্ঞানের পরিধি আজ বিস্তীর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার পৃথক বিশ্লেষণের জন্য আজ মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে। যেমন—সাধারণ মনোবিজ্ঞান, বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, উৎপত্তি-সন্ধানী মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, ইত্যাদি।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে তথ্য আহরণ সম্পূর্ণ হয় না। তাই যে কোন পদ্ধতির মূলেই পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে স্থূলভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(ক) পর্যবেক্ষণ বা প্রত্যক্ষীকরণ, (খ) পরীক্ষা। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করতে হলে পর্যবেক্ষণের (observation) একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একজনের মনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে গেলে বুঝতে হয় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। কারণ একজনের মনকে বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোঝা যায় না। বাইরের আচরণ ও

মনের কোন্ অবস্থায় কিরূপ বাইরের আচরণ হয় সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হয়। প্রত্যেকের কাছে তার নিজের মনই হল প্রত্যক্ষ— আর নিজের মনের খবর জেনে অন্যমনের খবর জানতে হয়। তাই মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এই অন্তর্দর্শনের কয়েকটি অসুবিধা আছে। কারণ যিনি দ্রষ্টা তাঁর নিজের মানসিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করতে হলে মনকে দুটি ভাগে পৃথক্ করে ফেলতে হয়। মনের একটি দিক হবে দর্শক, আর একটি দিক হবে দৃশ্য ; একটি প্রক্রিয়া, আর একটি বিষয়। আবার মনের কোন প্রক্রিয়ার দিকে সজাগ হতে হলে প্রক্রিয়াটির প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। রাগ কেমন জানতে গিয়ে দেখা গেল রাগ কমে গেছে।

তাই অন্তর্দর্শন বেশ কঠিন কাজ। তা ছাড়া এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ অনেক সময় বিজ্ঞানের প্রয়োজনকে মেটায় না। কারণ বিজ্ঞানের কাজ হল অনেক তথ্য থেকে একটি সাধারণ তথ্যে উপনীত হওয়া। যদি প্রত্যেকটি তথ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকে ও তার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভিত্তি না থাকে তবে তা থেকে সাধারণ সূত্রে আসাও কঠিন হয়ে পড়ে। এই জন্যে অনেকে বলেন যে আমরা অতীত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি স্মরণ করতে পারি মাত্র, কিন্তু মনের বর্তমান রূপকে প্রত্যক্ষ করা বড়ই কঠিন। এই দিক থেকে ব্যবহারবাদীদেরও বিশেষ আপত্তি। তাঁরা তাই বাইরের আচরণকে পর্যবেক্ষণ করে অন্তরের খবর পেতে চান। তাঁদের মতে প্রত্যেক মনের প্রক্রিয়া আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। মুখে চোখে, তা ফুটে উঠে। তা ছাড়া মনের অবস্থা দেহের যে যে পরিবর্তন ঘটায় তা প্রায় সর্বজনীন। দুঃখ হলে সবাই কাঁদে, ক্রোধ হলে সকলের মুখচোখেই একরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু একথা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ আছে। কারণ বিচিত্র মানুষের মন।

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে যার মানে হল আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, ভাষণ, চোখমুখের বিকার এইসব দেখে অন্তর্গত মনকে বোঝা যায়।

মনোবিজ্ঞানের যে পদ্ধতি বর্তমানে অবলম্বন করা হচ্ছে তার মূল কথা এই শ্লোকটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। ব্যবহারবাদীদের প্রচেষ্টাও হল তাই।

কিন্তু আজ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে তার মধ্যে আছে প্রশ্নমালা দিয়ে মনকে জানবার পদ্ধতি; নানা প্রকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মনকে বুঝবার পদ্ধতি ও সাক্ষাতে কথাবার্তা শুনে ব্যক্তিত্ব নিরূপণের পদ্ধতি বা একজন সম্পর্কে অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করে তা থেকে ধারণা জন্মানোর পদ্ধতি (Case study)। কিন্তু প্রত্যেকটি পদ্ধতির পেছনে একটি না একটি অনুমান রয়েছে।

তবে মূলতঃ দুটি পদ্ধতিই লক্ষ্য করা যায়। একটি হল Method of Impression বা অন্তর্দর্শন ও ব্যক্তিগত ধারণার ওপর ভিত্তি করে আর একটি হল Method of Expression অর্থাৎ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-বিশেষের আচরণ লক্ষ্য করে তাকে বুঝতে চেষ্টা করা। প্রত্যেক পদ্ধতিরই সুবিধে অসুবিধে দুইই আছে।

প্রয়োজনীয় পুস্তকের নির্ঘণ্ট

Woodworth—Contemporary Schools of Psychology
Vernon P. E.—Structure of Mind
Ross—Groundwork of Educational Psychology.
Sandiford—Foundation of Educational Psychology.
Vernon P. E —Measurement of Abilities.
Macc—Recent Trends in Psychology.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—মনোবিজ্ঞান

প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার মূল্য

শিক্ষা আজ নূতন রূপে দেখা দিয়েছে। তাকে আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করবার চেষ্টা চলছে। শিক্ষাবিজ্ঞান একটি জটিল শাস্ত্র। কারণ, মানুষের মনকে নিয়েই তার সমস্যা। ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব কীভাবে অঙ্কুরের অবস্থা থেকে ক্রমপরিণতি লাভ করে, তা না জানলে শিক্ষাকার্য সার্থক হয়ে ওঠে না। খেয়াল-খুশি-অনুযায়ী জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিলেই যে বীজ পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, এমন কোনো কথা নেই। তাই শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ পাথেয়।

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞান আজ হাত ধরাধরি করে চলেছে। শিক্ষার লক্ষ্যকে রূপায়িত করতে হলে কখন, কী ভাবে, কী কী শিক্ষা দিতে হবে, সে সম্পর্কে চেতনার প্রয়োজন। এমন একদিন ছিল, যখন শিক্ষকের দায়িত্ব ছিল কেবল খেয়াল অনুযায়ী শিক্ষাদানের মধ্যে আবদ্ধ। শিশু কী চায়, কী পেলে সে আনন্দ পায়, তার গ্রহণ করবার শক্তি কতদূর, সে বিষয়ে ঔদাসীন্যই দেখা দিত। তখন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক। বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মন ভরিয়ে তুলতে পারতেন, তথ্য পরিবেশন করবার নৈপুণ্য যাঁর থাকত, তিনিই যোগ্য শিক্ষক বলে বিবেচিত হতেন। ফলে তথ্যের চাপে শিশুমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। অনেক সময় সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয় জানতে বাধ্য করা হত। শিক্ষকের রুদ্রমূর্তি শিক্ষার্থীকে ভয়বিহ্বল করে তুলত। "Spare the rod and spoil the child"—এই নীতিই ছিল জনপ্রিয়। কিন্তু এখনকার নীতি হয়েছে—"Spoil the rod and and spare the child." কারণ, শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি না থাকলে শিক্ষাকার্য যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে।

শিশু জীবন্ত পুতুল বা শিক্ষাগ্রহণের আধার মাত্র নয়। প্রত্যেক শিশুই একটি জীবন্ত সত্তা, একটি বিশিষ্ট প্রাণের প্রতীক। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন। বহু কবির ভাষায় তাই শিশুর আবেগোচ্ছল প্রাণবন্ত রূপ চিত্রিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিশু-দরদী মন রচনা করেছে নূতন শিশুতীর্থ স্নেহের পরশ দিয়ে। "রুশোর" রসস্নিগ্ধ চিত্ত কেঁদে উঠেছে নিপীড়িত অসহায় শিশুর জন্যে। তাইতো তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন শিশুমনের সাথে পরিচয়ের সার্থকতার কথা। আর তাঁরই শিষ্য "পেস্টালৎসি" শিশুকে একটি জীবন্ত অঙ্কুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেছেন, আর সে-ধারা বিষয়বস্তুর অনন্ত পারাবার ও শিশুর রহস্যময় অন্তরের মাঝে পথ করে নিয়েছে! আজ জন অ্যাডাম্স (John Adams) শেখানোর দুটি দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে বিষয়বস্তুর দিকেও যেমন দৃষ্টি দিতে হবে, শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তির দিকেও সেরূপ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ তাদের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে পড়ে "Jug and mug theory" অর্থাৎ জলপাত্রে জল ভরবার পদ্ধতি। তাদের মতে; শিশুর মন হল শূন্য জলপাত্রের মতো, আর তাকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করাই হল শিক্ষকের কাজ।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী শিশুর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই। সে যেন একটি মৃৎপিণ্ড, যাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষক রূপ দিতে পারেন। এখানে শিশুর মনকে ও ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হয়েছে। তাই এই মতটি প্রতিষ্ঠিত হবার পথে অনেক সমালোচনা দেখা দিল। আর দেখা দিল, শিশুর প্রতি সহানুভূতি ও সজাগ দৃষ্টি। শিশু যে গতিশীল ও প্রাণবন্ত! অঙ্কুর থেকে যেমন বনস্পতির উদ্ভব, তেমনি শৈশব থেকে পরম পরিণতির পথে মানবশিশুর অভিযান। প্রকৃতিরাজ্যে বাড়ন্ত চারা-গাছের মতো শিশু ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আর, সেই এগিয়ে যাবার পাথেয়

যোগান শিক্ষক আর অভিভাবক তাঁদের স্নেহযত্নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শিশু-সম্পর্কে চেতনা যতই বাড়তে থাকল, মনস্তত্ত্বের উপরও তত বেশী দৃষ্টি পড়ল। শিশুকে বুঝবার চেষ্টা, তার আবেগ-উচ্ছ্বাসকে বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস শুরু হল। ফলে গড়ে উঠল শিক্ষামনস্তত্ত্ব। এটি মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ শাখা। কারণ, শিশুকে কেন্দ্র করেই এর সমস্ত আয়োজন।

এখন শিক্ষামনস্তত্ত্ব শিক্ষাদানকার্যে কতটা সহায়ক হয়, তাই বিবেচনা করতে হবে। একদিকে শিক্ষা আর অন্যদিকে মনস্তত্ত্ব—এ দুটির যখন সমন্বয় ঘটল, তখন আর কিছু হোক না হোক, শিশু অন্ততঃ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল। কারণ, আগে শিশুর ব্যক্তিত্বের কোনো মর্যাদা না দিয়েই, তার চাওয়া-পাওয়ার দিকে কোনো লক্ষ্য না রেখেই, শিক্ষার যে আয়োজন করা হত, তাতে শিশু হত উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত। কিন্তু মনস্তত্ত্বের কল্যাণে শিশু-মনকে জানবার যে সুযোগ জুটল, তাতে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির ঘটল পরিবর্তন। কেবল বিষয়বস্তুর পরিবেশন শিশুর কমনীয় প্রাণে বিশেষ কোনো রেখাপাত করে না। তাই শিক্ষকের সব পাণ্ডিত্য শিশুর কাছে অর্থহীন হয়ে যায়, যদি না শিশুর শক্তি ও রুচি বুঝে শিক্ষাদানের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়।

আজ প্রত্যেকটি শিক্ষকের কাছে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের জ্ঞান একটি পরম পাথেয়। শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির সাথে পরিচিত হবার পথে এর দানকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা হল এমন একটি বিষয়, যা মানুষের সমগ্র জীবনেও শেষ হয় না। এর পরিধি বিরাট ও বিস্তীর্ণ। যে-সব প্রভাব শিক্ষাকে সুগম করে তোলে, তার মাঝে শিক্ষকের প্রভাব কম নয়। শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান, এদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শিক্ষাদান কার্যে শিশুর প্রতি দরদ যে সবচেয়ে মূল্যবান, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সৃষ্টিরাজ্যে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক, তাইতো দেখি মিলের চেয়ে গরমিল বেশী ; আকৃতিতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষে মানুষে বিপুল ব্যবধান।

আর এই ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায়, প্রত্যেকের শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও রুচি এক নয়। তা সত্ত্বেও যদি একই সামগ্রী একইভাবে সকলের মাঝে পরিবেশন করা যায়, তাহলে তার পরিণতি অনুমান করা কঠিন নয়। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান শিশুকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত পার্থক্য নিরূপণ করবার পক্ষেও এর অবদান অসামান্য। তাছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কতখানি বাস্তবে রূপ পেতে পারে, এ-বিষয়ে ভবিষ্যৎ-বাণী করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন। শিক্ষার আদর্শ পরীক্ষার জন্যে তাই মনোবিজ্ঞানের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

মনোবিজ্ঞান আজ শিক্ষাজগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ, একাধিকক্ষেত্রে এর প্রয়োজন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন :

(ক) শিক্ষার্থীর শক্তি, সম্ভাবনা ও প্রবণতাকে বোঝবার জন্যে।

(খ) বুদ্ধির তারতম্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিভাগের জন্যে।

(গ) জীবনের বিভিন্ন স্তরবিভাগ ও বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবার জন্যে।

(ঘ) ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও এক ব্যক্তিত্বের উপর আর-এক ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করবার জন্যে।

(ঙ) গণমনের সাহায্যে শিক্ষার্থিচিত্তের সামগ্রিক পরিচয় পাবার জন্যে।

(চ) মানব-মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করে মানসিক ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

(ছ) শিক্ষা ও শিক্ষণকে মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুযায়ী সার্থক করে তোলবার জন্যে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মনস্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে আজ শিক্ষার কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ, দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়।

কিন্তু কেমন করে মনস্তত্ত্ব শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবে, এই হল প্রশ্ন। তাই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রয়োজন স্বীকৃত হল। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষ কেবল নিজের কথাটিই বেশী করে বুঝতে পারে।

অপরের মনের কথা বুঝতে হলে অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে আরও শক্তিশালী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এইজন্যেই আচরণবাদ বা আচরণের উপর ভিত্তি করে মানুষের মন বোঝবার চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না। কারণ, সব সময়েই আচরণকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্তরের সত্য পরিচয় মেলা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের ভাব ও ভাবনার গতিপথ যে আঁকাবাঁকা। তাই একই রকম আচরণের মূলে বিভিন্ন মনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। এইজন্যেই আজ নানাভাবে মানব-মনের বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস চলেছে; কিন্তু কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে আজ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। তবে একথা মানতেই হবে যে মনোবিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে সে অপরিহার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও শিক্ষা

প্রায়ই দেখা যায়, শিশুর মনোরাজ্যের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত না থাকলে, শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় না। সাধারণতঃ চঞ্চল শিশুচিত্তের দুটি বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অনেক সময় অজানার প্রতি কৌতূহল শিশুর মনে আন্দোলনের ঝড় তোলে। সেই অজানার রহস্য ভেদ করবার জন্য তার আয়োজনের সীমা থাকে না। এই অতৃপ্ত বাসনাকে সফল করবার জন্যই সে অজানার সন্ধানে অভিযান শুরু করে। আবার দেখা যায়, শিশুর একান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে থেকেই শিশুচিত্ত আনন্দরস উপভোগ করবার চেষ্টা করতে থাকে।

শিশুদের মন কখনও হয় নূতনের পূজারী, আবার কখনও তাদের মধ্যে পুরাতনকে ধরে রাখবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে

শিশুচিত্তের প্রতি এত সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন। কারণ, শৈশবে যে-সব কামনা অপূর্ণ থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনে এই অতৃপ্তির জন্যই সে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক পথ খুঁজতে থাকে। অনেক সময় শিশুর অনর্গল প্রশ্নে শিক্ষক ও অভিভাবক-গণ ধৈর্যচ্যুত হন। কিন্তু তখন পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিশুর নতুন পরিচয়। সেই নবীন বয়সে যে এই সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিক, একথা বেশীর ভাগ শিক্ষক ও অভিভাবক ভুলে যান। ফলে শিশুর কৌতূহল অপূর্ণ থেকে যায় ও তার জানবার উৎসাহ যায় কমে।

শিশুকে একই প্রকারের খেলা ও কাজ প্রতিদিন করতে দেখে অনেকে বিরক্ত হন ও শিশুকে নিরস্ত হতে বলেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের প্রতিদিনের কাজকর্মের কথা একটু ভেবে দেখি, তাহলে আমাদের কাজকর্মও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কাছে হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। ছোট মেয়েরা পুতুল খেলে, ঘর-বাড়ি খেলা করে। আমাদের বাস্তব সংসার দেখেই তারা কল্পনার রঙ মিশিয়ে নিজেদের খেলাঘর রচনা করে। এই খেলাধূলার মধ্য দিয়েই তাদের অনুকরণ প্রবৃত্তির বিকাশ দেখা যায়। খেলাঘরের মধ্যেই বৃহত্তর জীবনের প্রতিচ্ছবি তারা খুঁজে পায় ও বড়দের ভূমিকা অনুযায়ী তারা এক একটি ভূমিকা পছন্দ করে নেয়। ভূমিকা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ প্রাধান্য প্রকাশ পায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও যথেষ্ট খেলাধূলা, গল্প, ছড়া ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান আবশ্যক।

নেতাদের মধ্যে দেখা যায়, নিজ প্রাধান্যবিস্তারের প্রচেষ্টা। ঠিক শিশুদের মধ্যেও একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। শিশুর জীবনেও প্রকাশের বাধা ঘটলে, তা সহজেই প্রকট হয়। তাই মনোমত কাজ না করতে পেলে তারা লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ করে। কিন্তু তাকে আমরা এই অযথা রাগারাগির হাত থেকে নিবৃত্ত করতেই চেষ্টা করে থাকি। এই ক্রোধ-প্রকাশের ক্ষমতা যে প্রাণশক্তিরই পরিচয়, সে-কথা আমরা ভুলেই যাই। তাই তার ওপর মাঝে মাঝে আমরা ক্রোধপ্রকাশের জন্য নির্যাতনও করে থাকি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এই বিষয়ে সজাগ হওয়া উচিত, তা না হলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি হতে পারে।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে চুরিবিদ্যা বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, ছাত্রেরা 'চুরি করছি' এইরকম মনোভাব নিয়ে চুরি করে না। ছুরি, বই, খেলনা, পেন্সিল প্রভৃতি যা-কিছু নেয়, সব কিছুরই মূলে আছে সংগ্রহ করবার প্রবল প্রবৃত্তি। সেখানে সে যা দেখে ও যা পায়, সেগুলি নিয়ে নিজের বাক্স পূর্ণ করে। এই সংগ্রহ করার নেশা এত প্রবল হয় যে, আপন পর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। কোনো কোনো ব্যক্তির এই নেশা আজীবন থেকে যায়। অনেকের বাক্সে কয়লা থেকে আরম্ভ করে হীরা পর্যন্ত পাওয়া যায়। অনেক শিশু পথের ঢিল পাথর থেকে আরম্ভ করে বনফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিজেদের ছোট ছোট বাক্সগুলি ভরতি করে আনন্দ পায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের এই সারাদিনের সঞ্চিত জিনিসগুলোকে সামান্য আবর্জনা মনে করে তাদের আদরের বস্তুগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে তাদের মন থেকে এই মূল্যবান সংগ্রহ প্রবৃত্তির নির্বাসন ঘটে। অনেক সময় শিশু যা পেতে ইচ্ছা করে, আমরা তার প্রতি উদাসীন থেকে যাই। আমাদের এই উদাসীনতার জন্যই তাদের অপূর্ণ কামনা নানাপ্রকার কু-অভ্যাসে পরিণত হয়।

সঙ্গকামনা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, এর মূলে আছে মানুষের সাথে মেলামেশার প্রবৃত্তি। তাই শ্রেণীর অন্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে ও মেলামেশা করে শিশুরা আনন্দ পায়। তাদের এই প্রকৃতির মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে ব্যাহত না করে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষকের কর্তব্য।

প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ ও বীরপূজা শিশুদের আর একটি সহজাত বৃত্তি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভয়ে ভীত হয়ে ছাত্ররা আত্মসমর্পণ করে। আর শিক্ষকও নানাপ্রকার শাস্তির ভয় দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু এইভাবে শাস্তিদানের প্রবৃত্তি থেকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ, এই প্রবৃত্তি শিশুদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়।

জীবনের শৈশবকেই শিক্ষার্থীদের স্বর্ণযুগ বলা চলে। তাদের চিত্তবৃত্তি কোমল থাকার জন্যেই চিত্তনিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে থাকে।

বর্তমান ভারতে যে-সমস্ত বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলি শিশুদের কাছে কারাগার বললেও অত্যুক্তি হয় না, আর শিক্ষকগণ যেন সেই কারাগারের প্রহরী। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক থাকতে পারে, একথা বললেও আজ অনেকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই বিকৃত মনোভাবের জন্য আমরা কাকে দায়ী বলে মনে করব? ছাত্রসমাজ আজ বিপথকেই উপযুক্ত পথ বলে বেছে নিয়েছে, ফলে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য থেকে দিনের পর দিন দূরে সরে যাচ্ছে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, জন্ম থেকেই কোনো ছাত্র দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। তাই "শিব গড়তে গিয়ে যদি বানর তৈরী হয়" তার জন্য কিশোর ছাত্রদের দায়ী করা চলতে পারে কি? আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, বর্তমান যুগের ছাত্রদের চিত্তের দৈন্য ও অভাব-অভিযোগ দূর করবার কোনো চেষ্টাই করা হয় না। তাদের সক্রিয় মনের উপযুক্ত খোরাক না দিতে পারার জন্যেই বিদ্যালয়ের এত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

প্রতিকূল পরিবেশ ও আদর্শের অভাবের জন্যেই কিশোরদের সুপথে চালিত করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। তাই এই চঞ্চল কিশোর ছাত্রদের চালনা করতে হলে, চাই ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা খুবই অল্প। শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য ও শিক্ষকগণের দুরবস্থা হচ্ছে এর মূল কারণ।

পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে, যতদিন পর্যন্ত ছাত্রগণের সৃজনস্পৃহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান না দেওয়া হবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত পার্থক্য

বর্তমান যুগ হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ। তাই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। জনসাধারণের জন্যেই শিক্ষাব্যবস্থা। তবুও যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ সত্তার বিকাশলাভে সক্ষম হয়, সেদিকে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। তাই তাদের চিত্তবৃত্তি-অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

মানুষের মধ্যে সাধারণ কোনো পার্থক্য নেই সত্য, কিন্তু মানুষে মানুষে যথেষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। তাই শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা, শ্রেণী-পরিচালনা এবং অন্যান্য শিক্ষা-পরিকল্পনা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনের ত্রুটি, তৎপরতা ও চিত্তবৃত্তি, আকারগত বৈশিষ্ট্য, সঞ্চয় ও অভাব প্রভৃতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্তমানে ছাত্ররা যাতে প্রত্যেকে একই উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায় ও নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখাই কর্তব্য।

কী কী কারণে ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায়, তা বলা দুরূহ।

অনেকের ধারণা জন্মের পর থেকেই যে যার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। বিভিন্ন পরিবেশের জন্য ব্যক্তিগত জীবন নানাভাবে রূপায়িত হয়। আবার (১) সহনশীলতা, (২) মানসিক শক্তি ও ধ্যান-ধারণা, (৩) সপ্রতিভতা, (৪) বোধ ও উপলব্ধির ক্ষমতা, (৫) আবেগ ও অন্য প্রকার চিত্তবৃত্তির বিচার করলে বোঝা যায়, কেন মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রভাব ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় ও একই শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থিগণ এক পরিণতি লাভ করতে পারে না।

আবার দেখা যায়, পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্যই মানুষের অনুরাগ ও আগ্রহ, লক্ষ্য ও আদর্শ, চরিত্র, প্রবৃত্তি ও কর্মকুশলতা এক এক করে প্রকাশ পায়।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি জীবন স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। আপনার নিজস্ব ধারায় ব্যক্তিত্বের উপাদান গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই এই পার্থক্য নির্ণয় করবার জন্যেই নানারকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও তারতম্য কতদূর, তা নির্ধারণের জন্যে কয়েক প্রকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা মনীষিগণের মতে সব থেকে আগে করা উচিত। অধিকাংশ ব্যক্তির ধারণা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য সব থেকে বেশী। কিন্তু সমরুচি ও সমবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তাই মনে হয়—"No two persons are alike."

এখন কী উপায়ে বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে, দেখা যাক। প্রথমে একই বয়সের কতকগুলি ছাত্রছাত্রীর ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধির একটা সাধারণ মাপকাঠি ঠিক করা হয়। এই সাধারণ মাপকাঠি দিয়েই তাদের মোটামুটি বুদ্ধি ও ধীশক্তি বোঝা যায়। তখন তাকে একটি বিশেষ বয়সের পর্যায়ে ফেলা হয়। ইংরাজীতে এর নাম Mental age. এই বয়সকে তার যথার্থ বয়স দিয়ে ভাগ করে I. Q. (মানসিক মান) পাওয়া যায়। তা দিয়ে প্রত্যেকের একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হয় ও এর ফলে প্রত্যেকের বুদ্ধি-সম্পর্কে একটা ধারণা হয়।

কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারেই নয়, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করবার নতুন উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই প্রয়োজনীয়তা যে শুধু আজকের দিনেই স্বীকার করা হচ্ছে তা নয়; অতীতে প্লেটো ও অন্যান্য মনীষিগণ ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি

অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। প্লেটো, গল্টন প্রভৃতি মনীষিগণের বহুদিনের অক্লান্ত সাধনার ফলেই আজ ব্যক্তিগত পার্থক্য ও মেধা, রুচি, শক্তি, সহিষ্ণুতা, আবেগ, স্থৈর্য, বৃত্তিবৈচিত্র্য অনুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে সকলেই তৎপর হয়েছেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ও সাধারণ ছাত্রের একই পাঠনব্যবস্থা থাকার জন্যেই তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না।

আজকের দিনে বৈচিত্র্য নির্ধারণ করবার পর শিক্ষার্থিগণের বুদ্ধিবৃত্তি-অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা হলে, প্রত্যেকের স্বাধীন সত্তার বিকাশলাভ সহজ হয়। প্রত্যেকের কাছে আপন ব্যক্তিত্ব, রুচি, শক্তির পথ আপনা থেকেই উন্মোচিত হবে। আমেরিকা ও রাশিয়াতে এই নিয়ম অনুসারে শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ ঘটেছে। শুধু পাশ্চাত্যই নয়, আমাদের স্বাধীন দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার যত দ্রুত প্রচলন হয়, ততই মঙ্গল।

গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-নির্ণয়ের সমস্যা-সমাধানের আয়োজন চলে আসছে। ফলে বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ও তাদের শক্তি-অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। সেজন্যে "ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা" থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাপদ্ধতির নানাপ্রকার উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান যুগের উইনেট্‌কা বা ডল্টন পরিকল্পনা অন্যতম।

ডল্টন-পরিকল্পনার সার্থকতা সব থেকে বেশী দেখা যায়। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের বুদ্ধি, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য সহনশীলতা, ধীশক্তি, সপ্রতিভতা ও আবেগের প্রাবল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক অবস্থার ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

আবার, অন্য কতকগুলি কারণকেও এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের মূলে দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে লিঙ্গ, জাতি, বয়স, পরিণতি, বংশ ও পরিবেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও উপাদান ক্রমশ জটিলতর রূপ ধারণ করে। ফলে এর সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই এই বিভ্রান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তবে একমাত্র পার্থক্য নিরূপণ করাই চরম উদ্দেশ্য নয়; সেই অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়োজন দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই হল প্রধান লক্ষ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার পথে কয়েকটি স্থান

শিখবার পথে মনের প্রস্তুতির যে আয়োজন তাকে সুগম করতে হলে, চাই শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি। কীভাবে অজানা থেকে জ্ঞানের পথে শিশু এগিয়ে যেতে পারে, কীভাবে একে একে শিশুমন শিক্ষার আলোকে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, সে-বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে, শিক্ষার পথ শিশুর কাছে দুর্গম বলেই মনে হয়। কোনো কিছুকে আপনার আয়ত্তাধীন করবার নামই শিক্ষা। ভাবজগতেই হোক আর কর্মজগতেই হোক, পুরানো অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে নূতনের পথে যে জয়যাত্রা, তাই তো শিক্ষা। এই পথে আসতে পারে অনেক বাধা, ঘটতে পারে অনেক ভুল-ভ্রান্তি; কিন্তু ভুলগুলিকে শুধরে নিয়ে ক্রমশ ঠিক পথ বেছে নিতে পারাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

অভিজ্ঞতার ফলে যে পরিবর্তনের স্পর্শলাভ করা যায়, তা শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা শিক্ষাকে সুগম করে।

শিক্ষার নানারকম সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণকে পরিমার্জিত করবার নামই শিক্ষা।

সমস্যা-সমাধানের রীতিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার সঞ্চার। কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ বাধা অতিক্রম করে নূতন পথের উদ্ভাবন করতে পারে। অনেকে আবার শিক্ষাকে কর্মজগতের চেয়ে মনোজগতের সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, পরিবেশ-অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের নামই শিক্ষা।

শিক্ষার নীতিকে অনেকেই নানাভাবে উপস্থাপিত করেছেন। "থর্নডাইক" প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা শেখা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। এর মধ্যে যোগসূত্রস্থাপনের উপর কেউ কেউ জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, অতীত অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান সমস্যাকে যুক্ত করে তার সমাধান খোঁজবার চেষ্টাই হল শিক্ষার গোড়ার কথা।

দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজক সাহায্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়া সৃষ্টির দ্বারাও নাকি শিক্ষার পথ সুগম হতে পারে। বারংবার একই উত্তেজক উপস্থাপিত করে যখন মনের কোনো প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তখনও শিক্ষা ঘটতে পারে। এ ছাড়াও আর একটি বিশেষ মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে, যার নাম হল "সমগ্রতা মতবাদ"। কোনো কিছুকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকে বুঝবার চেষ্টা করা নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়। "কফ্‌কা" ও "লিউয়িন্"এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও শেখার কয়েকটি সরল সূত্র "থর্নডাইক" আবিষ্কার করেছেন।

থর্নডাইক দীর্ঘদিনের গবেষণার পর শিক্ষার বিধিগুলি কতকগুলি সূত্রে নিবদ্ধ করেন। সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষার-কার্যকারণ-সম্পর্ক ও মূল কথাগুলি এই নীতিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তিনটি প্রধান ও পাঁচটি অপ্রধান সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনটি প্রধান সূত্র হচ্ছে :—

১। ফলাফলের সূত্র (Law of effect)

২। পৌনঃপুনিকতা সূত্র (Law of exercise)

৩। প্রস্তুতির সূত্র (Law of readiness)

এই তিনটি ছাড়াও তিনি যে পাঁচটি অপ্রধান সূত্রের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি যথাক্রমে একাধিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র, উপমানের সূত্র, আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র ইত্যাদি।

১। ফলাফলের সূত্র :

পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা নূতন অভিজ্ঞতাকে বুঝতে পারি। আর এই অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল শিক্ষা। বাহির-বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই পরিবেশের মাধ্যমে আমাদের কাছে উত্তেজকরূপে ধরা দেয়, আর তাদের প্রভাবেই শুরু হয় শিক্ষা।

প্রত্যহ এমনি করে আমাদের অভিজ্ঞতার ডালি তিলে তিলে পূর্ণ হতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতার সবগুলি যে আনন্দময়, তা নয়; তাদের মধ্যে কতকগুলি মধুর, কতকগুলি বা তিক্ত। মধুর অভিজ্ঞতাগুলি সাধারণতঃ আমাদের স্মৃতিপটে গভীরতর রেখাপাত করে বলে অনেকের বিশ্বাস, আর যা অমধুর, তাকে আমরা ভুলতেই চেষ্টা করি। তৃপ্তি, আনন্দ ও মধুর অনুভূতি শিক্ষাকে সুলভ করে তোলে; তাইতো শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার বিষয়কে, পরিবেশকে মধুময় করে তোলা। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, Nothing succeeds like success—অর্থাৎ সাফল্যের আনন্দই অন্য সাফল্যকে ডেকে আনে। যে একটা কাজে সফল হয়েছে, তার পক্ষে অন্য একটি কাজে সফলতালাভ করা সহজ হয়ে আসে।

২। পৌনঃপুনিকতার সূত্র :

অনুশীলন ও অভ্যাস আমাদের শিক্ষা-ব্যাপারে পূর্ণতা ও সার্থকতা দান করে। পুনরাবৃত্তি দ্বারা কাজ ক্রমশঃই ভ্রান্তিহীন হয়ে আসে। জড়তা ও সঙ্কোচ কমে গিয়ে শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। আমরা যখন কোনো কাজ করি, তখন আমাদের যে শিক্ষা হয়, তাকে ইংরাজীতে বলে, Learning by doing.

যতবার কাজটি করা যায়, ততই তাতে নৈপুণ্য জন্মে; আবার অব্যবহারের ফলে কর্মে জড়তা ও ভ্রান্তি দেখা দেয়। এই অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা শেখার নামকে ইংরাজীতে 'trial and error method of learning' বলে। শিক্ষার এই নীতির মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না; তাই যাতে শিক্ষার্থিগণ অনুশীলনে তৎপর হয়, সে-বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। এই পুনরাবৃত্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতার ও স্মৃতির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। যা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি, যে-শিক্ষা সাম্প্রতিক, তা সহজে ভোলা কঠিন। পুনরাবৃত্তির ফলে প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে সার্থক ও আনন্দদায়ক। ফলে শিক্ষার পথে অগ্রগতি ঘটে।

৩। প্রস্তুতির সূত্র ঃ

প্রত্যেক সাধনার মূলে প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমরা যখন কোনো কিছু নূতন বিষয় শিখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠি, তখনই শিক্ষার পথ সুগম হয়। আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ শিক্ষার মূল কথা। ফলে আজ আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানের আয়োজন চলেছে। যাতে স্বেচ্ছায় সানন্দে শিশু কোনো কিছু শিখতে পারে, সেজন্য আজকের শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশেষ সজাগ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের চিত্তকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন তাই দিকে দিকে শুরু হয়েছে। একদিকে ফ্রয়েবেল, অন্যদিকে মণ্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ শিশুর প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কাজের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়। স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিশুরা খুবই ভালোবাসে। এইজন্যই শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীকে কর্মে উদ্দীপিত করা, কর্মের প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়া। নানাভাবে শিক্ষকের এই দায়িত্ব নির্বাহিত হতে পারে। কখনও প্রচুর আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, কখনও বা শিক্ষার মধ্যে নানারূপ ক্রীড়ার সংযোজনা করে খেলার ছলে শিক্ষার মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করাই হল বাঞ্ছনীয়।

যখন কাজের পেছনে একটা আগ্রহের তাগিদ থাকে, তখন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে মানুষ এগিয়ে যায়। কর্মকে গতিশীল করে তোলে ইচ্ছার প্রাবল্য। মানুষ কাজের প্রেরণা পায় নানাভাবে। কখনও পুরস্কারের আশা, কখনও তিরস্কারের আশঙ্কা, কখনও স্তুতি, কখনও প্রশংসা, কখনও বা প্রতিযোগিতা এই উদ্দীপনার মূল উৎস। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষককে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী অনুপ্রেরণা পায় ও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়।

শিক্ষার মূলসূত্র কয়টি ছাড়াও আরও পাঁচটি অপ্রধান সূত্রের কথা থর্নডাইক বলেছেন ঃ

(ক) একই উত্তেজকের বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response to the Same External Stimulus) ঃ

একই বিষয় বা বস্তু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যতই বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই তুচ্ছ তুচ্ছ উত্তেজক ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য যায় বেড়ে। তাই শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই অনুভূতি সঞ্চার করা।

(খ) মানসিক অবস্থা বা প্রস্তুতির সূত্র ঃ

কোন উত্তেজকের ফলে কিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা বেশীর ভাগ নির্ভর করে দেহ-মনের সাময়িক অবস্থার ওপর ; যেমন একই বর্ষা কখনও সুখকর আবার কখনও বিরক্তিজনক বলে মনে হয়। তাই শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর দেহমনের অবস্থা বুঝে উত্তেজক উপস্থাপিত করতে হবে।

(গ) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (The Law of Partial Activity) ঃ

শিক্ষার গোড়ার কথা হল সামগ্রিক দৃষ্টির অনুশীলন। তখনই কোনো বিষয়বস্তুর শিক্ষা সম্ভবপর হয়, যখন সেই বিষয়ের সাথে সামগ্রিক পরিচিতি

ঘটে—অর্থাৎ সমগ্র জিনিসটির সঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সম্পর্কবোধ স্পষ্ট হয়। তাই কোনো বিষয়বস্তুর খণ্ড-ছিন্ন একটি অংশ সমগ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। এইজন্য শিক্ষকের কাজ হল কোনো বিষয়বস্তুর সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টির অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

(ঘ) উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy)

সমজাতীয় বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনায় শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। তাই থর্নডাইক বলেছেন অনুরূপ অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়া সেই অবস্থা দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে। তাই তুলনা করে মনের মধ্যে কোনো বিষয়কে সুস্পষ্ট করতে পারলেই শিক্ষা সুগম হয়। আর শিক্ষকও তাই এই তুলনামূলক আলোচনার দিকে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন।

(ঙ) The Law of Associative Shifting

অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষকের অক্ষমতা বা বদ-মেজাজের জন্যে তিনি যে বিষয় পড়ান, তার ওপরেও শিক্ষার্থীর বীতরাগ জন্মায়। তাই থর্নডাইক বলেছেন যে এক অবস্থার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও সেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

দেহ-মন

আমাদের আহার, বিহার, আরাম, বিরাম প্রভৃতি সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক কাজের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক তার কাজ চালায় আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য নিয়ে। আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন করে তাদের নির্দিষ্ট কাজে লাগাবার ভার স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর।

শরীরের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিই স্নায়ুশিরার সাহায্যে মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের সংঘটন খুব তাড়াতাড়িই হয়। সাধারণ কাজে লাগে আধ সেকেণ্ড সময়। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে ডান দিকে আর বাঁদিকে বারোটা করে স্নায়ু শরীরের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য নিচের দিকে নেমেছে। এই স্নায়ুশিরাগুলিই আমাদের, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করে। মস্তিষ্ক থেকে যেমন বারো জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকেও তেমন একত্রিশ জোড়া স্নায়ু শরীরের নানা জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঐসব স্নায়ু বিভিন্ন জায়গার খবর মেরুদণ্ডে পৌঁছে দেয়। মেরুদণ্ড তখন সেই খবর মস্তিষ্ককে জানায়। আমাদের দেহের ঘ্রাণ, স্পর্শানুভূতি, শ্রবণ, বুদ্ধি প্রভৃতি এই ৮৬টি স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়াও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী নামে আর এক রকম স্নায়ুমণ্ডলী আছে। এরা মেরুদণ্ডের দুপাশে থাকে। এরা ক্রোধ, উত্তেজনা, অনুভূতি প্রভৃতির পিছনে কাজ করে। আর একটি স্নায়ুমণ্ডলী আছে যারা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজগুলির বিপরীত কাজ করে। ফলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজগুলি বাধা পেয়ে সংযত হয়ে পড়ে।

স্নায়ুকোষ (Neurons)—প্রতিটি স্নায়ুই বহু নিউরনের সমষ্টি। এই নিউরনের সাহায্যেই স্নায়ুরা ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত খবরগুলি মস্তিষ্কে পাঠায়।

স্নায়ুশিরাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

1 জ্ঞানদা (Sensory) 2. কর্মদা (Motor)

3. সংযোগী (Connectives)

Sensory ও motor nerve যথাক্রমে অনুভূতি জাগায় ও কাজ করায় বলে এদের ইংরাজীতে afferent ও efferent nerves বলে।

Sensory—এরা ইন্দ্রিয়দের আহৃত জ্ঞান মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। এরা কেবল মাত্র আবেগগুলি ভিতরে পৌঁছে দেয়; তাই এদের ইংরাজীতে in-carrying nerves বলা হয়।

Motor—এরা মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্ক-নির্দিষ্ট আবেগ পেশী বা গ্রন্থিতে পৌছে দেয়। এদের কাজ আবেগকে বাইরে নিয়ে যাওয়া। তাই এদের ইংরাজীতে বলে out-carrying nerves.

Connectives—কেবলমাত্র অনুভূতি ও কাজের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে।

প্রত্যেক স্নায়ু-কোষের একটি করে কেন্দ্রীয় কোষ থাকে। কেন্দ্রীয় কোষ থেকে একদিকে একটা সুতোর মতো শাখা বের হয়। একে বলা হয় axon। আবার অন্যদিক থেকে কতকগুলো সরু সরু সুতোর মতো অঙ্গ বের হয়। এগুলিকে বলা হয় Dendron। Axonগুলি লম্বায় আধ ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। axonগুলি সাধারণতঃ সরল। Dendronগুলি অনেকটা ঠিক গাছের প্রধান মূলের সঙ্গে লাগা শাখা-মূলগুলির মতো। এরা সব সময় শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে থাকে। কতকগুলি স্নায়ুকোষ একত্র হয়ে Ganglia সৃষ্টি করে। স্নায়ুকোষগুলি কর্মধারা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত।

Synapse—বিভিন্ন স্নায়ুকোষের axon-এর শেষ অংশ ও dendron পরস্পর যুক্ত হয়ে Synapse-এর সৃষ্টি করে। এই যোগাযোগের সময় এরা এক সঙ্গে জুড়ে যায় না। এই সাইন্যাপসের ভেতর দিয়েই এক স্নায়ুকোষ দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষে আবেগ সহজেই পথ করে নেয়। এইভাবে অসংখ্য synapse-এর মধ্যে দিয়ে আবেগ মস্তিষ্কে পৌছয়। এর গতিপথ একমুখী। প্রতিদিন আমাদের শরীরের কোটি কোটি স্নায়ুকোষ কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই কাজের ফলে তাদের রসদ যায় ফুরিয়ে। তখন আসে অবসাদ। রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে স্নায়ুকোষেরা নিজেদের রসদ সংগ্রহ করে। পুষ্ট হয়ে পরদিনের কাজের জন্য অপেক্ষা করে। আমরা দেখি মদ খেয়ে লোকে দুঃখ ভোলে, মর্ফিয়া নিয়ে রোগের যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পায়। এগুলো আর কিছুই নয়, এই সব অতি উত্তেজক জিনিসগুলো স্নায়ু-সন্ধির বাধাকে প্রবল করে তোলে। ফলে দুঃখ-যন্ত্রণার

অনুভূতিগুলো আর মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয় না। তাই ঐ সময়টায় দুঃখ-যন্ত্রণা আর টের পাওয়া যায় না।

এই স্নায়ু-সন্ধিগুলো ভেদ করে যেতে আবেগের প্রথমটা কিছু অসুবিধা হয়। বার বার যাতায়াতের ফলে পথটা কিছু সুগম হয়। কারণ স্নায়ু সন্ধিরা সহজে কোনো আবেগকে তার নির্দিষ্ট পথে যেতে দেয় না, বাধা দেয়। কারণ এই আবেগের আগের একটি আবেগ ঐ সব স্নায়ু-সন্ধির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে তার নিজের পথকে সহজ করে নিয়েছিল। নতুন আবেগ এসে সেই আগের পথটি ধরে যায় না। তার ফলেই এই বাধার সৃষ্টি। আমরা যখন নতুন কোনো কিছু শিখি, সে কবিতাই হোক, অঙ্কই হোক বা অন্য কিছুই হোক, প্রথম বার আমাদের একটু অসুবিধে হবে। তারপর বারে বারে অভ্যাস করতে করতে জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে। কারণ তখন স্নায়ু-সন্ধির পথটি সরল হয়ে গেছে। সেখানে আর বাধা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই বারংবার কোনো কাজ করার অভ্যাসের একটা দাম আছে। অনবরত কাজের জন্য স্নায়ু-সন্ধিগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই তখন আর তার কাছ থেকে ভালো কাজ পাওয়া যায় না। তাই তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়। সেটা খানিকটা বিশ্রামের সাহায্যে সম্ভবপর হয়। অনেক সময় দেখা যায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বহুক্ষণ একটা কবিতা নিয়ে বসে আছে। কিছুতেই মুখস্থ করতে পারছে না। সেই সময় তাদের যদি বলা হয় ১০ মিনিট ঘুরে এসো, তারপর মুখস্থ করো, তাহলে ভালো ফল পাওয়া যাওয়া যায়। অনেক সময় গভীর রাত্রে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে হচ্ছে। কিছুই মনে থাকছে না। কিন্তু পরদিন ভোরে সেই পড়াই সহজে হয়ে গেল। আবার অনেকে রাত্রিতে চা, কফি প্রভৃতি খেয়ে ঘুম তাড়িয়ে পড়াশুনো করে। চা বা কফি এই ধরনের জিনিস শরীরে উত্তেজনা আনে। উত্তেজনায় স্নায়ু-সন্ধির বাধা কিছুটা দূর হয়। কিন্তু এইভাবে উত্তেজক দ্রব্যের সহায়তায় কাজ করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

মস্তিষ্ক—প্রাণিজগৎকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বর্তমান মানুষের এই পরিণতি হয়েছে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে। আচার আচরণে সে অন্য সকল প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার বোধ-কেন্দ্র মস্তিষ্ক। সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার মস্তিষ্কের গঠন ও আকার উন্নততর। প্রাণিজগতে এককোষী অ্যামিবার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। সে তার ঐ একমাত্র কোষ দিয়েই সবকিছু করে। সামান্য অ্যামিবা থেকে বহুকোষী মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে, আর সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভিতর আস্তে আস্তে বোধ এসেছে। আবার মানুষের মধ্যে সেই বোধ পূর্ণতা পেয়েছে।

কিন্তু মস্তিষ্কের পরিমাপটাই সবচেয়ে বড় নয়। দেখা গেছে বহু মনীষীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম। আলোক-প্রাপ্ত সভ্য মানুষের চেয়ে এক জাতের এস্কিমোর মস্তিষ্ক বৃহৎ হলেও তাদের বুদ্ধি বেশী নয়। বুদ্ধি নির্ভর করে অন্য বিষয়ের ওপর। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে মগজের ভিতর বিভিন্ন নিউরনরা কত কাছাকাছি হয়ে সাইন্যাপসের সৃষ্টি করেছে তার উপর।

যার মাথায় যত বেশী এই কাজ হবে তার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তত বেশী। ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কে এই সাইন্যাপসের সংখ্যা খুবই কম থাকে।

আমাদের মাথার নিউরনগুলো দু রঙের। সাদা এবং ছাই রঙের। যার মাথায় যত ছাই রঙের নিউরন আছে তার বুদ্ধির কৌশল তত বেশী। সাদা জিনিসের কাজ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। শৈশবে এগুলি তৈরী হয় না। আর বার্ধক্যে এগুলির অবনতি হয়। সেই জন্যে এই দুই সময়ে বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে যায়। ছাই রঙের জিনিস মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, চিন্তার পরিচালন, বিচার বিবেচনা প্রভৃতির সহায়।

মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি ছোট-বড় খাদ আছে। মস্তিষ্কের মধ্যে এই খাদ যার যত বেশী হবে তার ছাই রঙের জিনিস তত বেশী থাকবে। তাই বুদ্ধিমান লোকেদের মস্তিষ্ক বেশী কোঁচকানো, তার খাদের সংখ্যাও বেশী।

আমাদের দেহের ডান দিকের সমস্ত শিরা-উপশিরা মস্তিষ্কের বাঁ ধারে এসে মিলেছে আর বাঁ ধারের শিরা-উপশিরাগুলি এসে মিলেছে মস্তিষ্কের ডান দিকে। তাই আমাদের ডান দিকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্তা বাম মস্তিষ্ক, আর বাঁ দিকের নিয়ন্তা ডানদিকের মস্তিষ্ক।

গুরু মস্তিষ্ক (cerebrum) আমাদের মাথার অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। ঘাড়ের একটু ওপর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মাথাটাই এর অধিকারে। cerebrum প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত। Cerebrum এই স্নায়ুমণ্ডলীর আবেগকে বয়ে আনে। আর এখান থেকেই সেই আবেগের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট অঙ্গে গিয়ে পৌছয়। Cerebrum-এর এক-এক অংশ এক-একটা কাজ করে। যে অংশগুলিতে আবেগ এসে তার উপস্থিতি জানায় তাকে বলে sensory area। আর যে জায়গাগুলি থেকে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট হয় তাকে বলে motor area। আর যে এই অংশগুলির মধ্যে সংযোগ করে তাকে বলে connective area। লঘু মস্তিষ্ক (Cerebellum) cerebrum-এর নীচে আর ঘাড়ের ওপরে থাকে। Cerebellum-এর দুই ভাগ। আমাদের দেহে বহু পেশী আছে। আমাদের বহু কাজ আছে যা করতে দেহের একাধিক পেশীর সাহায্য নিতে হয়। Cerebellum এই সব পেশীর নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘাড়ের নীচের থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট হাড়ের সমষ্টি হল মেরুদণ্ড। এরা সোজা নীচের দিকে নেমে গেছে। এই ছোট ছোট হাড়গুলির মধ্যে আছে মেরুমজ্জা। প্রত্যেক হাড়ের সংযোগ থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে। এইগুলি মেরুদণ্ডের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে আবার একসঙ্গে মিলেছে। এইগুলির আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। এইগুলি বিভিন্ন পেশী, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মিশেছে।

আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজের মূলে পেশী। মস্তিষ্ক প্রতিটি আবেগের একটি করে প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট পেশীতে পাঠায়। পেশী তা কাজে পরিণত করে। দেহের সমস্ত পেশীকে আমরা প্রধানতঃ

দু ভাগে ভাগ করতে পারি, ঐচ্ছিক আর অনৈচ্ছিক। সাধারণতঃ বাহ্য দেহের কাজে আমরা যে পেশীগুলোকে ইচ্ছেমতো চালনা করতে পারি সেগুলিকে বলে ঐচ্ছিক পেশী। কিন্তু আমাদের দেহের ভেতরের যে কাজগুলো আপনা থেকেই হয় সেই কাজে পেশীগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। এগুলি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এরা অনৈচ্ছিক। যেমন রক্তচলাচল, পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস—এগুলি অনৈচ্ছিক পেশীর কাজ। কলকব্জা যন্ত্রপাতির কাজের মূলে যেমন লিভার থাকে তেমনি পেশীদের কর্মশক্তির মূলেও আছে বিভিন্ন রকমের লিভার। আমাদের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াবার পেছনে কাজ করে নানারকমের লিভার। ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে সঙ্কোচনশীল ও প্রসারণশীল এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। সঙ্কোচনশীল পেশীগুলির সাহায্যে আমরা কোনো জিনিসকে টানতে পারি, চাপ দিতে পারি। আর প্রসারণশীল পেশীদের দিয়ে এর উল্টো কাজগুলোই করি। যেমন, কিছু ছুঁড়ে দেওয়া, বা সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। মস্তিষ্ক-প্রেরিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই ফুলে ওঠা পেশীদের ধর্ম। অনৈচ্ছিক পেশীদের আমরা ঐচ্ছিক পেশীর মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থার প্রভাব এই পেশীগুলির ওপর খুব বেশী পড়ে। ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থ্য এই পেশীগুলির কাজে বাধা দেয়। আর মানসিক স্বাস্থ্য যখন সজীব থাকে তখন এদের কাজ ভালো হয়। মানুষের সুখ-দুঃখের ওপর সবরকমের পেশীরই শক্তি নির্ভর করে।

পেশীর আলোচনায় আমরা দেখেছি কর্মশক্তির মূলে আছে পেশী। সুতরাং তার পরিপোষণ, বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তি জাগরূক করবার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। পেশীর পুষ্টি খাদ্যগ্রহণে এবং ব্যায়ামে। খাদ্য পরিপাকের কাজটা পেশীকেই করতে হয়। আর পরিপাকের মধ্যে দিয়েই তার নিজের পুষ্টিসাধন করতে হয়। কাজের ফলে ক্ষয় হয়, তাই পূরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। খাদ্য সেই ক্ষয় পূরণ করে। পেশীকে সক্রিয় ও তার কর্মশক্তি বাড়াবার জন্য ব্যায়ামের দরকার। ঐচ্ছিক পেশীগুলি এই

ব্যায়ামে বিশেষ উপকৃত হয়। অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপর থাকে ঐচ্ছিক পেশীগুলি। তাই ব্যায়ামের ফলে ঐচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টি পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টির সহায়তা করে। তবে অত্যধিক ব্যায়ামের ফলে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ভালো হয় না। ফলে তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ ভালোভাবে করতে পারে না। কোনো পেশীকেই একটানা একটা কাজে নিযুক্ত রাখলে সেই পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বহুক্ষণ ধরে একটানা লিখে গেলে হাত টনটন করে। তখন ঐ পেশীর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যদি আবার লেখা যায় তবে সজীবতা ফিরে আসে। পেশী যদি সতেজ থাকে তাহলে আমাদের দেহ অক্সিজেন বেশী করে নিতে পারে। অক্সিজেন আমাদের দেহের ভিতরের গ্লানি দূর করে, দেহে সজীবতা আনে। পেশীরা যাতে তাদের কাজ ভালো করে করতে পারে তার জন্য আধুনিক নার্সারী স্কুলগুলোয় পেশীর সুষ্ঠু সঞ্চালনের উপযোগী নানা কাজ দেওয়া হয়।

গ্রন্থি—আমাদের দেহের গ্রন্থিদের মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। একরকম Duct glands আর একরকম Ductless glands.

এই দুই রকমের গ্রন্থিই রস ক্ষরণ করে। Duct glandsগুলির ক্ষরণ বাহ্যিক। যেমন আমাদের নাক, চোখ, জিব প্রভৃতি থেকে যে জল পড়ে তা এই গ্রন্থিরই কাজ। Ductless glandগুলির ক্ষরণ আমরা চোখে দেখতে পাই না। তারা দেহের মধ্যে রস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তে সঞ্চারিত হয়ে এই আমাদের দেহের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে। এদের হর্মোনও বলা হয়। Ductless glandগুলির মধ্যে থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারি প্রভৃতি নানা রকমের গ্রন্থি আছে। দেহের উপর এই গ্রন্থিগুলির প্রভাব লক্ষণীয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি—এই গ্রন্থিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থি যদি তার নির্দিষ্ট রস ক্ষরণ না করে তাহলে শরীরের চামড়া শুকিয়ে যায়, চর্বি যায় কমে, মাথার চুল উঠে যায়, শরীরে তাপ কমে যায়, শরীর আর বাড়ে না।

এর অভাবে শরীরেরও যেমন ক্ষতি হয়, মানসিক অবস্থারও তেমনি অধঃপতন হয়। কোনো কাজে উৎসাহ থাকে না। দিনরাত ঘুম আসে। বুদ্ধির ধার নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ cretin নামে যে জড়বুদ্ধি লোকেদের দেখা যায় তাদের ঐ অবস্থার মূলে থাইরয়েডের প্রভাব। এই জাতীয় জীবেদের দেহে থাইরয়েড রসক্ষরণ হয় না। থাইরয়েডের কাজ যে বয়েসেই বন্ধ হোক না কেন সেই বয়েসেই শরীরের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে না।

যদি থাইরয়েডের ক্ষরণ বেশী হয় তাহলে কম ক্ষরণের ঠিক উলটো ফলই দেয়। দেহের অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। শরীরে উত্তেজনা হয়। মানুষ চঞ্চল হয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে।

থাইরয়েড গ্রন্থির আমাদের দেহ মন ও তাদের কার্যকলাপের উপর বিশেষ প্রভাব আছে। থাইরয়েডের চিকিৎসা করে রোগগ্রস্ত বহু লোককে সুস্থ করা হয়েছে।

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি—এই গ্রন্থি যদি নিয়মিত রস ক্ষরণ না করে তাহলে শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের রঙের পরিবর্তন হয়। দেহ ক্রমাগত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়। এই গ্রন্থি বেশী কাজ করলে পুরুষদেহের রোম বৃদ্ধি পায়, মানুষ আনন্দ বেদনায় সহজেই উত্তেজিত হয়। স্ত্রীদেহে এই গ্রন্থির বেশী কার্যকারিতায় পুরুষভাব প্রকাশ পায়।

এই গ্রন্থি যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে তাহলে পেশীরা সতেজ হয় ও কর্মক্ষমতা যায় বেড়ে। পেশীরা যখন বেশী পরিশ্রম করে তখন তাদের উত্তাপ বেড়ে যায়। এই উত্তাপের সমতা আনবার জন্য ঘাম হয়। এই গ্রন্থি ঘাম বেরনোয় সাহায্য করে। এই গ্রন্থি বীরকে বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করে, আবার কাপুরুষকে পলায়নে সাহায্য করে।

পিটুইটারি গ্রন্থি—এই গ্রন্থি ভালোভাবে কাজ না করলে দেহের বৃদ্ধি হয় না। midgets নামে জড়বুদ্ধিদের রোগের মূলে এই গ্রন্থি। এদের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের মতো হয় না। এর রসক্ষরণ বেশী হলে দেহে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর যোগ বেশ বেশী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিনিবেশ ও তার প্রকৃতি

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিনিবেশ যে একটা বড় জায়গা দখল করে রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অভিনিবেশ থেকেই আসে একাগ্রতা ও কর্মতৎপরতা। আধুনিক কালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুরা যে পড়ায় মন দিতে পারে না সে দোষ একমাত্র তাদের নয়। শিশু যে-বিষয় পড়ছে সেটাতে সে রস না পেলে তাতে মন বসে না। বিষয়টা যদি তার হৃদয়গ্রাহী হয় তবেই তার সে সম্বন্ধে কৌতূহল জাগবে, আর সে-বিষয়ে সে মনোযোগী হবে। তাই আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষাব্রতীদের।

অভিনিবেশ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে অভিনিবেশ মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ পদ্ধতি। আমাদের পরিবেশের মধ্যে বহু জিনিসই আমাদের দৃষ্টিপথে আসে। কিন্তু তারই মধ্যে (কোনো বিশেষ জিনিস নিয়ে আমরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করি, তার একটা স্পষ্টতর রূপ দেখবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টাটুকুকেই বলা হয় অভিনিবেশ বা মনোযোগ।) আমরা যখন কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিই তখন সেই নির্দিষ্ট বিষয়টিকেই বলা হয় মনোযোগের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের চারিদিকে একটা পরিবেশ থাকে। এই যে মনোযোগের ক্ষেত্র, একে বলে field of attention। মনোযোগের কেন্দ্রে আমাদের চেতনা স্পষ্ট। মনোযোগের ক্ষেত্রে আমাদের চেতনা কিছুটা অস্পষ্ট। এরপর যেখানে আমাদের চেতনা একেবারেই অস্পষ্ট সেটাই হচ্ছে অমনোযোগের ক্ষেত্র। মনোযোগ অমনোযোগ নির্ভর করে আমাদের মনের ওপর। এই মুহূর্তে যেটা মনোযোগের কেন্দ্র সেটাই

পরমুহূর্তে অমনোযোগের অন্ধকারে সরে যেতে পারে। কোনো বিষয়ে আমরা যখন প্রথম মন দিই তখন সে-বিষয়টা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে না। পূর্ণ মনোযোগের ফলে সেই বিষয়টা আমাদের স্পষ্ট রূপ নেয়। এই স্পষ্ট রূপ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মন বিষয়ান্তরে চলে যায়। সামান্য জানা বিষয়কে পূর্ণভাবে জানার ইচ্ছা মনের একটা বিশেষ ধর্ম। (প্রকৃতপক্ষে অমনোযোগ বলে কিছু নেই। মানুষের মন সব সময় একটা না একটা জিনিসে আকৃষ্ট থাকে। সিনেমা দেখার সময় কেউ সিনেমা না দেখে হয়তো ভাবছে শেয়ার বাজারের ওঠা-নামার কথা। আপাতদৃষ্টিতে সে অমনোযোগী, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে অন্য বিষয়ে মনোযোগী।)

সামান্য জানা বিষয়টা যখন আমাদের চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখনই আমাদের সেই বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ কমে যায়। (বহুদূরে একটা জিনিস দেখে আমরা যতক্ষণ না সেটা ভালো করে বুঝতে পারি ততক্ষণ আমরা আমাদের সমস্ত মনোযোগ সেই দিকেই নিবদ্ধ করি। জিনিসটা জানা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে বিরাগ জন্মায়।)

আমাদের মন চঞ্চল। কোনো বিষয়েই মন একসঙ্গে বহুক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই খুব মন দিয়ে দু-পাতা পড়ার পরই হয়তো খোকনের মন চলে যায় খেলার মাঠে। মনের স্বচ্ছন্দচারিতা নির্দিষ্ট বিষয়ে অমনোযোগের কারণ। সুন্দর করে সাজানো ঘরের দিকে আমরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। প্রথমে আমাদের মন ঘরের সমগ্রতার উপর নিবদ্ধ থাকে। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘরের আসবাবপত্র, তার রঙ, তার অবস্থান, ফটো, তার বিষয়বস্তু, দেওয়ালের অলঙ্করণ, পর্দা প্রভৃতির ওপর নজর পড়ে। (এর থেকেই বোঝা যায় যে এক বিষয়ে আমাদের মন কিছুতেই বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকে না।)

লোকে দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধরে ভালো ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। সেই সময়টুকুতে হয়তো তাদের মনে অন্য কোনো বিষয়ই আসে না। কিন্তু ছবির ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই তার মন ওই সময়টুকুতে নিরন্তর খেলে বেড়াতে থাকে। এই ধরনের মনোযোগকে বলা হয় Sustained attention.

আমাদের বহু সময় মনে হয় যে আমরা দুটো বিষয়ে একসঙ্গে মনোযোগ দিচ্ছি। কিন্তু এই ধরনের মনোযোগের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বিষয়গুলি আমাদের মনে পর পর এমন তাড়াতাড়ি আসে যে মনে হয়ে যেন একই সঙ্গে দুটো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। যেমন বাগানের গোলাপ গাছের গোড়াটা খুঁচিয়ে দিতে দিতে গাছটার ফুলগুলির চিন্তা আসতে পারে। এই ধরনের সামান্য জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে মনোযোগ একটার থেকে অন্যটায় দ্রুত সঞ্চারিত হতে পারে। এতে মানসিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একই সঙ্গে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা দুটোতেই মনোযোগ এক রকম অসম্ভব। কারণ এতে যে পরিমাণ মানসিক শক্তির প্রয়োজন তা মানুষের নেই বললেই চলে। যাঁদের মানসিক শক্তি যথেষ্ট বেশী তাঁরা অনেক সময়ে একাধিক কঠিন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন। তবে সাধারণের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দুটি বিষয়ে মনোযোগের ফল ভালো হয় না। ছোট ছেলেরা যেদিন এক-মনে হাতের লেখাটা করে সেদিন তাদের লেখাটা ভালোই হয়। কিন্তু যেদিন হাতের লেখা করতে করতে অন্য পড়া বা অঙ্কের কথা ভাবে সেদিন হাতের লেখা তেমন হয় না। এ তো গেল ছাত্রদের কথা। শিক্ষাব্রতীদের সব সময় চারিদিকে চোখ খুলে রাখতে হবে। একই সঙ্গে ছাত্রদের পড়াতে হবে ও তারা পড়া শুনছে কিনা অন্যমনস্ক হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁকে সজাগ থাকতে হবে।

মনোযোগের ক্ষেত্রে অঙ্গ-সংস্থানেরও একটা মূল্য আছে। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে যদি পড়া যায় তাহলে মনোযোগটা বেশী তাড়াতাড়ি আসে ও বেশীক্ষণ থাকে। আরাম বা আয়েস করে পড়াশুনো হয় না।

অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের সামান্য শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ এটা হয় শিশুদের. তারা এক সঙ্গে অনেকক্ষণ একটা বিষয়ে সহজে মন দিতেও পারে না। সেইজন্য নার্সারী স্কুলগুলোতে অঙ্গভঙ্গি সহকারে নানারকম ছড়া ও গানের মধ্যে দিয়ে বহু জিনিস শেখানো হয়ে থাকে। বড়দেরও এ-রকম হয়। যারা আলাদা নির্জন ঘরে একলা বসে পড়তে অভ্যস্ত

তারা গোলমালে পড়তে পারে না। কিন্তু যারা চিরকালই পাঁচজনের সঙ্গে নানারকম গোলমালের মধ্যে মানুষ তাদের এতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সাধারণ ভাবে অনেকে বলেন যে গোলমালের মধ্যে মনোযোগটা প্রবল হয়। কেননা তখন আমরা মনটাকে অন্য সব বিষয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে দেবার চেষ্টা করি। বর্তমানের এই দারুণ অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের জন্য নির্জন জায়গার ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

মানসিক অবস্থার ওপর মনোযোগ একান্তভাবে নির্ভরশীল। মনোযোগের পেছনে রয়েছে আমাদের সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই আমাদের টেনে নিয়ে যায় অনুসন্ধিৎসা আর ইচ্ছার পথ বেয়ে মনোযোগের দিকে। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তিই আমাদের টেনে নিয়ে যায় আহারের সন্ধানে।

এ ছাড়া অল্প-জানা বিষয় অর্থাৎ আগে যে জিনিসের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন জিনিসে আমাদের সহজে মনোযোগ আসে। রাস্তা দিয়ে বহু লোক চলে, কিন্তু চেনা লোক দেখলেই তার দিকে নজরটা বেশী পড়ে।

মনোযোগের পেছনে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর দায়িত্ব যথেষ্ট। কেননা মনোযোগ দেওয়ার সময় সমস্ত স্নায়ুগুলো একযোগে কাজ করতে থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে তবেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের কাজ ভালো হয়। আবার মানসিক শক্তি নির্ভর করে শারীরিক সুস্থতার ওপর।

এইগুলো হল ব্যক্তির দিক ; আর যে-বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে তারও কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার।

দেখা যায় যে কোনো নতুন জিনিস মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। অভিনবত্ব মনোযোগের একটা বিশেষ কারণ। যেমন চিড়িয়াখানার মেরুভাল্লুকরা দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। কেননা তারা অপরিচিত। শিক্ষার্থীরাও তেমনি নতুন কিছু দেখলে সে-সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবে ও সে-সম্বন্ধে জানতে চাইবে।

বড় জিনিস ছোট জিনিসের থেকে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। মাছের বাজারে বড় বড় মাছগুলোই ক্রেতাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ

করে। মস্ত বড় একটা গ্লোব ক্লাশে আনলেই সব ছাত্রেরই সেটার দিকে চোখ পড়বে ; সেটা দিয়ে কী হবে তা জানতে চাইবে।

হঠাৎ কোনো কিছু ঘটলে, হঠাৎ আগুন জলে উঠলে বা বিদ্যুৎ চমকালে আমাদের মন সেই দিকেই ছুটে যায়।

প্রচণ্ড শব্দ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ট্রাম চলতে চলতে যদি বেশ জোরে শব্দ করে থেমে যায় তখন প্রায় সকলেই সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। খুব ভারী জিনিস পড়ে গেলেও যে যে-কাজেই নিবিষ্ট থাকুক না কেন প্রত্যেকেরই মন সেই দিকে যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে গতিশীলতাও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হয়। রাস্তা দিয়ে বহু লোক চলে যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে ; কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যদি হঠাৎ দৌড়তে থাকে তাহলে তার দিকে সকলের চোখ পড়বেই।

সাধারণতঃ দেখা যায় একই বিষয় বেশীক্ষণ আলোচনা করলে বা একই দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখলে তাতে মনোযোগ ঠিক থাকে না। তার মধ্যে একটু পরিবর্তন হলেই আবার মনোযোগ আসে। মাছের বাক্সে অনেকক্ষণ ধরে মাছের আনাগোনা দেখতে দেখতে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তখনই যদি মাছেদের কিছু খাবার দেওয়া হয় তাহলে মাছেদের সেই দিকে ছুটে-যাওয়া মনকে আবার ঐ দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

আমরা দেখি যে ঝকঝকে, চকচকে বা খুব গাঢ় রঙের জিনিস আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। রাস্তার সাদা বাড়িগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো চুনকাম করা সেটার দিকেই আমাদের চোখ পড়ে আগে।

আমাদের চোখের ঠিক সামনে যেটা পড়ে বেশীর ভাগ সময়ে সেটার দিকেই নজর আগে পড়ে। কিন্তু সব সময় এটা হয় না। অনেক সময় খুব তুচ্ছ এক পাশের জিনিসও চোখে পড়ে।

আবার যে জিনিসটা আমাদের দরকারী মনে হয় সে-জিনিসে আমাদের বাধ্য হয়ে মনোযোগ দিতে হয়। যেমন অঙ্ক করতে যদি নাও ভালো লাগে তবুও বাধ্য হয়ে আমাদের তাতে মনোযোগ দিতে হয়।

মনোযোগের শর্তগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে যে-জিনিসটা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার একটা বিশেষ গুণ থাকা চাই। কারণ অন্য পাঁচটা জিনিস থেকে আলাদা হবার মতো গুণ না থাকলে আমাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ সেদিকে পড়ে না। আমাদের মনের একটা নির্বাচনী ক্ষমতা আছে। মন যখন সুস্থ ও সক্রিয় থাকে তখন তার নির্বাচনী ক্ষমতাটা বেশী থাকে। বিষয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। মনের দিকের এই প্রস্তুতিটুকু মনোযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

(মনোযোগের সঙ্গে আগ্রহের একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। কারণ যেখানে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নেই সেখানে মনোযোগ আসে না।) যা আমাদের ভালো লাগে না তা আমরা করতে চাই না। তবে এমন বহুক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। পড়াশুনো অনেকের ভালো লাগে না। কিন্তু না করলে চলে না তাই জোর করে সেই দিকে আগ্রহ আনতে হয়। এখানে আগ্রহের সঙ্গে স্বার্থের যোগ আছে। আগ্রহ বা ঔৎসুক্য মানুষের একটা সহজাত সংস্কার। মনোযোগের ক্ষেত্রে আমাদের মনের দিক থেকে যে প্রস্তুতি লাগে সেটা আসে এই সহজাত সংস্কার থেকেই।

অভিনিবেশের শ্রেণীবিভাগ

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রথমে মনোযোগকে আমরা মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত ও চেষ্টাকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যেখানে আমাদের মনোযোগ আপনা থেকেই আসে, তার জন্য কোনো চেষ্টা বা কষ্ট করতে হয় না সেটাই স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ। যেমন যে গান ভালবাসে তার গানের প্রতি মনোযোগ আপনা থেকেই আসে। তার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। এর ঠিক উল্‌টোটাই ঘটে চেষ্টাকৃত মনোযোগের বেলায়। যার গানে আগ্রহ নেই তার গান শিখতে হলে জোর করে তাতে মনোযোগ আনতে হবে।

স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে সংস্কারজাত মনোযোগ, আর একটা হচ্ছে অনুভূতিজাত মনোযোগ। সংস্কার-জাত মনোযোগ হচ্ছে সেই সব, যেগুলোতে আমাদের সহজাত সংস্কারের তাড়নায় আপনা থেকেই মন এসে যায়। খাদ্যান্বেষণ আমাদের একটা সহজাত সংস্কার। সে-বিষয়ে আমাদের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্ত। কেউ কম খায় কেউ বেশী খায়, কেউ বা তাতে বিলাস আনে, কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক, ক্ষুন্নিবৃত্তি। তাই মনোযোগের মধ্যে একটু উনিশ-বিশ থাকলেও মনোযোগটা সবারই থাকে। অনুভূতিজাত মনোযোগগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। অনেকে মিলে গল্প-গুজব করছে এমন সময় দূর থেকে একটা ভৈরবী সুরের রেশ ভেসে এল। তাদের মধ্যে সুরের সাধক যে, তার মন আপনা থেকেই উড়ে চলল সেই দিকে। আর হয়তো অনেকের কানেই গেল না। অনুভূতিজাত মনোযোগ-গুলি এই ধরনের হয়ে থাকে।

চেষ্টাকৃত মনোযোগকেও আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। একবারে জোর করে মন বসানো, আর বারে বারে চেষ্টা করে মন বসানো। কোনো কবিতা মুখস্থ করতে হবে; একবারে জোর করে কবিতাটাতে মন দিয়ে মুখস্থ করে ফেলা যায়। একে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা হয়। আবার একটা শক্ত অঙ্ক কিছুতেই হচ্ছে না। খালি ভুল হচ্ছে। বারে বার তার পেছনে চেষ্টা করে যে মনোযোগটা আনা হয় তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা হয়।

ব্যক্তিবিশেষে মনোযোগের তারতম্য হয়। কোনো কোনো লোকের মনোযোগ চঞ্চল। তাঁরা কোনো জিনিসেই বেশীক্ষণ মন দিতে পারেন না। তাঁদের অনবরত মনের ওপর একটু জোর খাটাতে হয়। আবার যাঁদের অচঞ্চল মনোযোগ তাঁরা অনায়াসেই যে-কোনো বিষয়ে মনোযোগকে আটকে রাখতে পারেন।

এ ছাড়াও অনেকে কোনো একটা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে থাকেন। আবার অনেকের মনোযোগটা হয় ব্যাপক। সাধারণতঃ বিজ্ঞানীরা গভীর-মনোযোগী হন। একটি সামান্য বিষয় নিয়ে তাঁরা গভীর গবেষণা

করেন। সাধারণ লোক ব্যাপক মনোযোগী। তাঁদের লক্ষ্য অল্প-বিস্তর সব জিনিসের উপরেই পড়ে। কোনো বিশেষ একটা কিছুকে নিয়ে তাঁরা লেগে থাকেন না। তবে তাঁরা প্রয়োজনে একই বিষয়ে মন দেন।

যাঁরা স্থির-মনোযোগী তাঁরা কোনো বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে থাকেন। যাঁরা অস্থির-মনোযোগী তাঁরা তা পারেন না।

শিশুদের মনোযোগে আর বয়স্কদের মনোযোগের মধ্যে তফাত থাকে। শিশুরা যে-সব জিনিসে উৎসাহী বয়স্করা তাতে নয়। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম—এইসব সম্বন্ধে বড়দের গভীর চিন্তা। বড়দের যা প্রিয় শিশুদের তা প্রিয় নয়। শিশুরা রঙীন জিনিস, খেলনা প্রভৃতি নিয়ে অবসর বিনোদন করে। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে রুচির কিছু তফাত থাকে। তাই মনোযোগের বিষয়বস্তুতেও তফাত। সূক্ষ্ম কাব্যকলাতে মেয়েদের মনোযোগ ছেলেদের চেয়ে বেশী। বিজ্ঞানের কারিকুরিতে ছেলেদের মনোযোগ বেশী।

এগুলো গেল ব্যক্তির দিক। বিষয়ের দিক থেকেও মনোযোগের ভাগ আছে। যেমন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনোযোগ ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য মনোযোগ। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত বিষয়ে মনোযোগ, যেমন ভূমিকম্প প্রভৃতিতে। আর পড়া বিষয়ে কঠিন আলোচনায় মনোযোগ বুদ্ধি-গ্রাহ্য। কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগে আমরা বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করি, আবার কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগের সময় আমরা বিষয়গুলির মধ্যে থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করি।

শিক্ষার সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধ আছে। মনোযোগ আমাদের অবাঞ্ছিত শ্রম ও সময় বাঁচায়। জানবার বহু জিনিস আমাদের চারিপাশে সব সময়েই রয়েছে। আমাদের বিঘ্নসঙ্কুল স্বল্প আয়ুতে তাদের আয়ত্তে আনা বেশ শক্ত। তার পরেও যদি প্রতিটি বিষয়ে মনোযোগের জন্য বেশ পরিশ্রম করতে হয় তবে তো আর কথাই নেই।

শিশুরা স্বভাবতই চঞ্চল। কোনো জিনিসেই তারা বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। আর নীরস জিনিসের বেলায় তো কথাই নেই। কেননা সহজে

তাতে মন দেবার পাত্র খুব কম ছেলেমেয়েই। পুরনো দিনের পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের হাতে থাকত বেত আর পাশে সর্দার পোড়ো। তাতে শিক্ষার চেয়ে পীড়নটা যে বেশী হত তাতে সন্দেহ নেই। নব্য যুগে তাই ভয়ের মধ্যে দিয়ে পড়াশুনো না শিখে আনন্দের মধ্যে দিয়ে যাতে শিখতে পারে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

শিশুদের পড়ায় মনোযোগটা যাতে চেষ্টাকৃত না হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় তারই প্রচেষ্টা করা উচিত। তাদের মনোযোগ নির্ভর করে তাদের পরিবেশের ওপর। তাই নার্সারী স্কুলগুলোতে গেলে বোঝা যায় যে সেটা শিশুদেরই জগৎ। সেখানে বড়দের ঠাঁই নেই। ছোটরা ঝকঝকে জিনিস পছন্দ করে। আমরা যদি শিশুপাঠ্য বইগুলোকে নানাভাবে রঙীন করে সাজাতে পারি তাহলে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগের চেয়ে তারা সেটাকেই তুলে নেবে। আর পড়ানোটাও সহজ হয়ে যাবে। এইভাবে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়েই তাদের আকৃষ্ট করতে পারি। গতানুগতিক ভাবে গুনতে না শিখিয়ে তাদের যদি কাঠের টুকরো, মার্বেল এ সব দিয়ে বসিয়ে দিই তাহলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই।

নীরস পাঠ সহজেই ক্লান্তি টেনে আনে। চিত্তাকর্ষক পাঠ শিক্ষার্থীদের ক্লান্তিকে দূর করে। অঙ্কের ক্লাশ ভালো লাগছে না, বিরক্তি আসছে। নানা অজুহাত জুটছে। কিন্তু তখনই যদি বলা হয় পরের পিরিয়ডে ভূগোলের ক্লাশে ভূগোল-বিষয়ক সিনেমা দেখানো হবে, তাহলেই দেখা যাবে যে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা যথেষ্ট এসেছে।

মনোযোগটা কতক্ষণ একটানা থাকতে পারে সেটা বিবেচ্য বিষয়। ছোটরা চঞ্চলমতি, তারা দশ মিনিট পনেরো মিনিট এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে, তাই তাদের বারে বারে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

মনোযোগের জন্যে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তার পরিমাপ শিক্ষা-ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। তাহলে মানসিক শক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীদের ভাগ করে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ

উচ্চ মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষা ব্যাহত হয় না। আর বিপরীত ধী-সম্পন্নদেরও তাদের পিছন পিছন ছুটতে হবে না।

গভীরভাবে বিষয়বস্তুতে যদি শিক্ষার্থীরা মনোনিবেশ করতে পারে তাহলে সেটা তাদের খুব তাড়াতাড়িই স্মৃতির ঘরে বন্দী হবে। হয়তো তাকে ভুলবে না। যে ছেলে কোনো কবিতা অমনোযোগের মধ্যে দিয়ে কুড়িবার পড়ে মুখস্থ করে সে-ই গভীর মনোযোগের সাহায্যে পাঁচবার পড়ে তাকে মুখস্থ করতে পারে। তার ফলে তার কিছুটা সময় বাঁচল। সেই সময় সে বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন করে অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে। অমনোযোগের পড়া সাময়িক ভাবে মনে থাকলেও বেশীক্ষণ তা থাকে না। আর বারে বারে পড়ার জন্যে তার যে অবসাদ আসে তা তাকে আর অন্য বিষয়ে টানতে পারে না।

কোনো একটা বিষয়ে মনোযোগ আমাদের অন্য বহু বিষয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। যদি ক্লাশে জিরাফ সম্বন্ধে পড়ানো হয় তবে প্রথমত তাকে কেন্দ্র করে প্রাণিজগতের মূল বিভাগ—মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী, এককোষী বহুকোষী, তৃণভোজী মাংসাশী ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তারপর তার আবাস, সেখানকার জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্টা ইত্যাদির কথাও বলা যায়। পৃথিবী অন্য কোন কোন অঞ্চলে অনুরূপ জলবায়ু, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে সেই অঞ্চলগুলির কথাও জানানো যায়।

এই ভাবে শিক্ষা দিলে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে বহু বিষয় শেখানো যায়। তাতে শিক্ষাটাও যেমন চিত্তাকর্ষক হয় সময়ও যথেষ্ট সংক্ষেপ হয়।

শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিটি বিষয়কেই এমন ভাবে আনতে হবে যা তাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। শিক্ষার্থী তার মনের সহজ বৃত্তি দিয়ে তাদের মধ্যে নিজের এলাকার বিষয়টাকে খুঁজে নিয়ে সেই দিকে মনোযোগী হবে। বাস্তব জগতে তার মূল্য কম নয়। চেষ্টাকৃত মনোযোগে স্বার্থের একটা সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু শিক্ষাব্রতীদের চেষ্টা হবে এই যে লেখাপড়া শেখার অর্থকরী দিকটাই যেন শুধু ছাত্রদের চোখে না পড়ে, তার যে অন্য একটা দিক আছে সেদিকেও যেন তাদের চোখ পড়ে।

সপ্তম অধ্যায়

স্মৃতি

মনে রাখা, ভুলে যাওয়া—স্মৃতি বলা যায় তখনই যখন আমরা আয়ত্তাধীন কোনো বিষয়কে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনানুযায়ী সেই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে পারি। প্রতিদিন আমাদের সামনে বহু ঘটনাই ঘটে চলেছে। প্রতিটি ঘটনাই আমাদের মনের ওপর বিস্তর কাজ করছে। কিন্তু সব কথাই আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু কতগুলি কাজ বা ঘটনা আমাদের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। আমরা অতি অল্প আয়াসেই সেই বিষয়গুলোকে মনে করতে পারি। স্মৃতির একটা যান্ত্রিক দিক আছে। যে-সব বিষয় বা ঘটনা যত বেশী পুনরাবৃত্তি করতে পারি সেই সব বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের স্মৃতি তত প্রখর হয়। কারণ পুনরাবৃত্তির ফলে স্মৃতির ছাপ আরও স্পষ্ট হয়। স্মৃতির মূলে মনের কয়েকটি ক্রিয়া আছে। প্রথমত বিষয়ের আয়ত্তীকরণ। নতুন বিষয়টা বারে বারে অভ্যাস করলে তবেই তা আমাদের মনের মধ্যে গাঁথতে পারে। এই গাঁথবার কাজের সময় আমাদের দেখতে হবে যে কত অল্প সময়ে আমরা কত বেশী জিনিস আয়ত্ত করতে পারি। কোনো বিষয় তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার মূলে আছে অভ্যাস। আবার অনেক সময় অনেক মজার ঘটনা আমাদের পুরনো দিনের বহু কথাকে মনে করিয়ে দেয়। ছোট বাচ্চাদের শুধু অ আ শেখালে স্বরবর্ণ মুখস্থ করাতে যে সময় বা শ্রম ব্যয় হবে, ছড়ার মধ্যে দিয়ে শেখালে তার চেয়ে অনেক কম সময় বা শ্রম ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয়ত, যে-বিষয়টা আমাদের আয়ত্ত হল সেটাকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তার ছাপ রেখে যায়। তবে কোনো ছাপ হয় খুব স্পষ্ট, আবার কোনোটা খুব অস্পষ্ট। নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার ঢেউ আমাদের পুরনো ছাপগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যায়। তাতে গভীর ছাপগুলোই জেগে থাকে আর অগভীরগুলো মনের গভীরে

ডুবে যায়। তাই অতীতের সব কিছুই আমাদের মনের মধ্যে সব সময় সচেতনভাবে জেগে থাকে না। কিন্তু অবচেতন মন অনেক বিষয় ধরে রাখতে পারে। তাই অনেকদিন আগের দেখা সিনেমা আবার দেখতে গিয়ে একটু পর থেকেই সব কথা আস্তে আস্তে মনে পড়ে যায়। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই যে আমরা সব সময় মনে করতে পারি তার কিছুই ঠিক নেই।

রজুকে আজ প্রথম স্কুলে যেতে হবে। তার মনে ভীষণ ভাবনা। মাস্টার-মশাইরা না জানি কী বলবেন। ভয়ে কাঠ হয়ে সে মাস্টারমশাইর সামনে দাঁড়াল। মাস্টারমশাই একটা যোগ দিলেন, সে কিছুতেই পারল না। কিন্তু ওরকম যোগ সে বাড়িতে অনেকই করে। অধীত বিদ্যা যদি আমরা মনে আনতে না পারি তাহলে সেখানে আমাদের স্মরণশক্তি অকেজো হয়ে রইল। পুরনো দিনের কথা বা কাজের একটা অংশ মনে করলেই স্মরণশক্তির কাজ সম্পূর্ণ হল না; সমস্ত কাজটা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতের ঘটনাগুলোকে আমাদের একই সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

স্মৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম যে স্মৃতি মূলত কেন্দ্রীয় স্নায়ু-মণ্ডলীরই কাজ। যখন কোনো উত্তেজক আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায় আসে তখনই জ্ঞানবহা স্নায়ুরা সেই আবেগকে পৌঁছে দেয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে। আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী কর্মবহা স্নায়ুদের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একটা খাতের সৃষ্টি হয়। একই ধরনের উত্তেজক যখন আবার আসে তখন আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। আগের বারের প্রতিক্রিয়ার পথেই সে চলে। বারে বারে একই কাজ করার ফলে যে সারল্য আসে তাকে বলা হয় অভ্যাস। অভ্যাসে পুনরাবৃত্তি হয় যান্ত্রিক প্রণালীতে, কিন্তু স্মৃতির বেলায় তা হয় না। মন এখানে সচেতন থেকে পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তাই স্মৃতিতে নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে সংরক্ষণ করলেই চলে না, তাকে প্রয়োজনমতো মনে করতে হয়।

স্মৃতির প্রকার-ভেদ—স্মৃতি সাধারণত দু-রকমের। একটা অভ্যাসগত স্মৃতি, আর একটা যৌক্তিক স্মৃতি। অভ্যাসগত স্মৃতিকে অনেকে Rote

memory বলেন। কারণ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই এই ধরনের স্মৃতির সৃষ্টি। যেমন নামতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নামতা মুখস্থ বলার পেছনে Rote memory-টাই বেশী কাজ করে।

যৌক্তিক স্মৃতি হচ্ছে সেই ধরনের স্মৃতি যেখানে আমরা কোনো বিষয়কে মনে আনি নিছক অভ্যাসবলেই নয়, সেই বিষয়ের অন্তর্নিহিত অংশগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করে। নৌকাডুবিতে বেঁচে যাওয়া লোক তুফানের দিনে নৌকোয় চড়লে নৌকাডুবির স্মৃতিতে ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া Desolutary memory বলে এক রকমের স্মৃতি আছে। এটা একটা বিশেষ মানসিক শক্তি। অনেকে কোনো বিশেষ ঘটনা, কোনো বক্তৃতার অংশ বিশেষ, কবিতা, সন-তারিখ প্রভৃতি নানাধরনের জিনিস মনে রাখতে পারে। স্মৃতির মাপকাঠির কতকগুলি প্রণালী আছে। যেমন আয়ত্তীকরণ প্রণালী। এই প্রণালীতে কতকগুলি কাব্য-সমষ্টি শিক্ষার্থীকে কিছুক্ষণ দেখিয়ে সরিয়ে নিয়ে তাকে বলতে বলা হয়। প্রথমে ভুল হয়। এবং যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ শেখানো ও বলানো পর্যায়ক্রমে চলে। প্রথম বারের মনে রাখার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের তুলনা করলে সংরক্ষণের আনুপাতিক হিসাব পাওয়া যায়।

স্মারণ পদ্ধতি (prompting method)—এতে শিক্ষার্থীকে বিষয়টা পড়িয়ে নিয়ে যতক্ষণ না সে সঠিক ভাবে বলতে পারে ততক্ষণ তাকে বলে দিতে হয়। ভোলার হারটা থেকেই সংরক্ষণের ক্ষমতা ঠিক করা যায়।

Scoring method—জোড়া জোড়া সাজানো শব্দ শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে নিয়ে তারপর জোড়ার একটা বলে অন্যটা বলতে বলা হয়। শিক্ষার্থীর ঠিক বলার অনুপাত ধরে মনে রাখার ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়।

যার মধ্যে এ-শক্তির পরিমাণ বেশী সে-ই বিশিষ্টতা অর্জন করে।

স্মৃতির মাপকাঠি ও স্থায়িত্ব—বিজ্ঞানে আর্কিমিডিসের সূত্র অনেকদিন আগে সেই সপ্তম শ্রেণীতে পড়া হয়েছে। নবম শ্রেণীতে যখন তার দরকার পড়ল তখন দেখা গেল অতি সামান্যই মনে আছে। কিন্তু আর-একবার পড়বার পরই সমস্ত জিনিসটা মনে ভালো করে গেঁথে গেল। প্রথমবার লিখতে যে সময়

লেগেছিল পরের বারে তার থেকে অনেক কম সময় লাগল, কারণ নানা রকম অভিজ্ঞতার ছাপের জন্য ঐ ছাপটা মনের মণিকোঠায় ম্লান হয়ে ছিল। আর একবার ঝালানো মাত্রই তা সতেজ হয়ে উঠল।

স্মৃতির স্থায়িত্ব সকলের সমান নয়। সাধারণ কথায় বুদ্ধিমানদের স্মৃতিশক্তি বেশী আর বোকাদের কম। কিন্তু হাজার বুদ্ধিমান হলেও স্মৃতির ক্ষেত্রে স্মরণশক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। কথায় আছে অনভ্যাসে বিদ্যাহ্রাস। তবে কোনো কোনো লোকের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিটা বেশী করে করতে হয় আবার কারুর বা কম বার করতে হয়। অনেকে তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আনতে পারে আবার তাড়াতাড়ি ভুলতেও পারে। অনেকে তাড়াতাড়ি আয়ত্তে এনে বহুদিন ধরে বিষয়টিকে সংরক্ষণ করতে পারে; অনেকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে ও দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারে। আবার অনেকে আয়ত্তে আনতেও যেমন দেরি করে ভুলতে তেমনি তাড়াতাড়ি পারে।

তবে ছন্দ বা মিল যে-সব বিষয়ে থাকে সেগুলো সাধারণতঃ মনে থাকে বেশী দিন। আমাদের অতি দুঃখের আবির্ভাব সুখের স্মৃতি, মনের কোণে বহুদিন ধরে বেঁচে থাকে। যে-সব বিষয়ের যুক্তি ও প্রমাণ আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি সেগুলো বেশীদিন মনে থাকে। জ্যামিতির সম্পাদ্য উপপাদ্য বুঝলে আর সহজে ভোলা যায় না। সাঁতার, স্কেটিং এই ধরনের বিষয় যা অঙ্গ-সঞ্চালনের ওপর নির্ভরশীল সেগুলো সহজে ভোলা যায় না।

বিস্মৃতির কারণ—আমরা সমস্ত জীবন ধরে বহু রকমের ঘটনার সম্মুখীন হতে থাকি। কিন্তু সব ঘটনা আমাদের মনে থাকে না। কতকগুলি অতি দুঃখের বা অতি সুখের স্মৃতি আমাদের মনে চিরকাল থেকে যায়। তাদের আমরা সাধারণতঃ কখনই ভুলি না। ঐ-সব স্মৃতি আমাদের মনে থাকে কারণ আমাদের মনের ওপর ঐ-সব ঘটনা এমন গভীর ছাপ ফেলে যায় যে শত চেষ্টাতেও আমরা তা মুছতে পারি না। বহু বিচিত্র বিরোধী ঘটনার ছাপ সেই ছাপকে মলিন করতে পারে না। অন্যান্য ঘটনাগুলো মুছে যাবার মূলে আছে মনের মধ্যে অন্যান্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ছাপের মেলা।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন তীরের পায়ের চিহ্নকে মিলিয়ে দেয় নতুন ঘটনার স্রোতও সেই রকম পুরনো ছাপকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যে-বিষয় বা যে-ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা কম হয় সে-সব বিষয় আমাদের মনে থাকে কম। কেননা পুনরাবৃত্তি স্মৃতির একটা উপাদান। ব্যবহার না করলে যেমন ছুরিতে মরচে ধরে যায় সেই রকম বহুদিন আগেকার পড়া একটা জিনিস পুনরালোচনার অভাবে বিস্মৃতির আধারে চলে যায়।

আমরা দেখি যে ভোর বেলা একটা কবিতা মুখস্থ করলাম, তার পরে আরও নানান কাজ করলাম। দুপুরবেলা কবিতাটা মনে করতে গিয়ে দেখলাম সমস্তটা ঠিক মনে আসছে না। তবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি বারে বারে কবিতাটা মনে করতাম তা হলে ঠিকই মনে থাকত।

তবে একই কাজ বারে বারে করলে মনটা সে-কাজে আর নিবিষ্ট থাকে না, তখন মনেও থাকতে চায় না। ছোট্ট ছেলের কিছুতেই ইতিহাস পড়া হচ্ছে না, তাকে জোর করে বারে বারে পড়ানো হচ্ছে। ফলে দেখা যায় তার পড়া কিছুই এগোয় নি। যা শিখেছিল তাও বলতে পারছে না।

যা আমাদের ভালো লাগে না তাকে আমরা স্থান দিতে চাই না। পরশুদিন বেড়াতে যাবার কথাটা খোকন ভোলে না কিন্তু কালকে ইংরাজী পড়া দেবার কথাটাই ভুলে যায়। তবে অনেক সময় ভুলতে চাইলেও ভুলতে দেয় না। পণ্ডিত মশায়ের সংস্কৃত পড়াটার কথা ঠিক মনে থাকে কেননা পড়া না পারলে পরিণামটা সেখানে সাংঘাতিক। কোনো একটা বিষয়ের প্রতিটি অংশ মনে সব সময় থাকে না, সবটা মিলিয়ে একটা ছবি মনে থাকে। দার্জিলিং থেকে বেড়িয়ে ফিরে সেখানকার প্রতিদিনের ঘটনা মনে থাকে না, কিন্তু সেই ক-দিনের একটা সমগ্র স্মৃতি মনে জেগে থাকে। আবার মনের বহু সাধ যেগুলো অপূর্ণ থাকে তারা মাঝে মাঝে প্রায়ই মনের পটে জেগে ওঠে।

ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে সকলের বিস্মৃতিটা এক ধরনের নয়। কেউ তাড়াতাড়ি ভোলে, কেউ বা ধীরে ধীরে ভোলে।

বিস্মৃতির প্রয়োজনীয়তা—আমাদের জীবনে বিস্মৃতির প্রয়োজনীয়তা

আছে। কেন না, বহু লজ্জাকর অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে। সেগুলোর চিন্তা আমাদের মনকে অনবরত পীড়া দেয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরকে ক্ষয় করে। ভুলতে যদি আমরা না পারতাম তাহলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। কেননা আমাদের দুঃখ ও লজ্জার বোঝা নিয়ত আমাদের কণ্ঠরোধ করত। প্রথম যখন মানুষ প্রিয়জনকে হারায় তখন কিছুদিন সে যে মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটায় সেই অবস্থাটা যদি চিরস্থায়ী হত তাহলে তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা বলবার নয়।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায় কিনা এটাই শিক্ষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। স্মৃতিশক্তি মানুষের জন্মগত। এর খুব বেশী একটা হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। কারণ এটা স্নায়ুমণ্ডলীর একটা কাজ। স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের ওপর স্মৃতি নির্ভর করে। অনুকূল স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ভালো ফল দেয়। স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের পরিবর্তন করা যায় না, তবে চেষ্টা করলে স্মৃতির অল্পবিস্তর হেরফের করা চলে। শিক্ষকের দায়িত্ব এখানেই। শিক্ষককে সব সময় পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে ছাত্র পাঠকে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর আয়ত্ত না করতে পারলে মনে রাখার কথাই ওঠে না। ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে যদি পড়ানো যায় তাহলে মনে থাকে বেশী। ছোটদের বারো মাসের নাম ছড়ার মাধ্যমে শেখালে সাধারণ ভাবে শেখানোর থেকে অনেক কম সময় লাগবে আর মনেও থাকবে। কেন না কৌতুক ও আনন্দ যেখানে বেশী সেই বিষয় তাদের ভালো লাগবে ও মনে থাকবে। বিষয়কে সব সময় সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক করে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। এস্কিমোদের বাড়ি কথায় না বুঝিয়ে যদি মডেলে বা ভালো ছবিতে দেখানো যায় তাহলে তা চিরদিন মনে থাকবে। প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার আগে যদি একটা পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করা যায় তাহলে পরিপ্রেক্ষিতের সূত্র ধরে বিষয়টিকে মনে আনা সহজ হয়।

পাঠকে ছাত্রদের কাছে অতি সহজসাধ্য করতে হয়। কানে শোনা বিষয় থেকে চোখে দেখা বিষয় বেশী মনে থাকে। তাই বিজ্ঞানে পাতার বিষয় পড়াবার সময় যদি শিক্ষার্থীদের বাগানে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন পাতার আকৃতি

প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে সেটা মুখে বোঝানোর চেয়ে বহুগুণ কার্যকরী হয়। আবার পর্যবেক্ষণমূলক কাজগুলো, যেমন বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও গাছে পরিণত হবার বিষয়টা যদি শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরীক্ষা করতে দেওয়া যায় তাহলে তাদের বিষয়টা মনে তো থাকবেই উপরন্তু উৎসাহ জাগবে। মনে রাখার মূলে আগ্রহ ও উৎসাহ। অন্য সমস্ত চিন্তা সেই সময়ের মতো সরিয়ে যদি কোনো বিষয়ে মন দেওয়া যায় তাহলে স্মৃতির ছাপ মনের উপর গভীর ভাবে পড়বে। Method of Correlation-এর উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আলাদা করে পড়ালে সময় লাগে বেশী এবং বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ছাত্ররা নির্ণয় করতে পারে না। সাধারণ ভাবে যে-কোন একটা বিষয় ধরে নিয়ে পড়ানো যায়। যেমন আমগাছের কথা দিয়ে আরম্ভ করলে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস পর্যায় ক্রমে শেখানো যেতে পারে। এতেও মনে থাকার স্থবিধে। কারণ একটা বিষয় মনে করলেই অন্য বিষয়গুলো চলে আসে। এখানেই Social Studies প্রবর্তনের সার্থকতা।

অনেক সময় শক্ত কথা মনে থাকে না। বাংলা দেশের সমস্ত জেলাগুলোর নাম মনে থাকছে না। তখন যদি আমরা এইভাবে শ্রেণী করে দি যেমন "ম" দিয়ে যে নামগুলি আরম্ভ সেগুলি একদলে যাবে, "ক" দিয়ে যাদের আরম্ভ তারা আরেক দলে যাবে। "ম" দিয়ে "ক" দিয়ে এই ভাবে শ্রেণী বিভাগ করলে মনে রাখার স্থবিধে হয়।

কিন্তু সব রকম প্রণালীর ওপর পুনরাবৃত্তি। যত বার পড়া যায় তত বেশী মনে থাকে। কথায় আছে, আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

অষ্টম অধ্যায়

কল্পনা

প্রত্যক্ষ ও কল্পনা—যে-সব জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তা প্রত্যক্ষ। আর যে সব বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বদলে মন আপনা থেকেই তার ছবি আঁকে,—তাই কল্পনা। আমাদের চারিপাশে যা ঘটে তাই চোখ আমাদের গোচরে আনে। কিন্তু মনের চোখ শুধু প্রত্যক্ষের ছবিই আঁকতে পারে না, যা অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর তারও ছবি আঁকতে পারে। এই ছবিই (imagery) হল কল্পনার উপাদান। কল্পনার বৈশিষ্ট্য এখানেই। কল্পনাতে শুধুমাত্র বাস্তবে যা ঘটে তারই আনাগোনা চলে না, তাকে আমরা নানা রঙে রঙীন করে অবাস্তবও করে তুলি। আমরা গাছের পাতা সবুজই দেখি, কিন্তু কল্পনাতে আমরা সোনার গাছে রুপোর পাতাও দেখি। প্রত্যক্ষের সম্পর্ক শুধু বর্তমানের সঙ্গেই। কিন্তু কল্পনার গতি বাধা-বন্ধ-হীন, অপরিসীম। কল্পনায় আমরা দূর-অতীতে চলে যেতে পারি, আবার অদূর-ভবিষ্যতেও যেতে পারি। মন তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করে। কখনও স্মৃতিমন্থন, কখনও রোমন্থন চলতে থাকে। বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে অনেক বছর দেখা হয় না। সে গেছে বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য। এখানে কল্পনায় বসে বসে তার কথা ভাবতে পারি। সে যে-দেশে গেছে তার চিঠির বর্ণনায় সে-দেশের কথা কল্পনায় আনতে পারি। ফতেপুর সিক্রীর ভাঙা রাজপ্রাসাদ দেখে মন ছুটে যেতে পারে আকবরের যুগের সেই বিলাস-ঐশ্বর্যের মধ্যে। কিন্তু প্রত্যক্ষের সেখানে কোনো ঠাঁই-ই নেই। ভবিষ্যতে কলকাতার শহরতলীর কী অবস্থা হতে পারে তারও একটা কল্পনা আমরা করতে পারি যদিও সেটা আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। তাই কল্পনার গতি সুদূরপ্রসারী।

প্রত্যক্ষে কোনো মিথ্যা নেই। কারণ বাস্তবে যা ঘটে ইন্দ্রিয়রা ঠিক সেটুকুই মনের গোচরে আনে। কিন্তু কল্পনায় বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে কম।

কল্পনার রচনা মনের মাধুরী দিয়ে। কল্পনার বিষয়বস্তু বাস্তব থেকে নেওয়া বটে কিন্তু মনের রঙে রসে সে এমন রূপ ধারণ করে যে তাকে তখন চেনা শক্ত হয়। কল্পনাতে মনের কাজ এমনই হয় যে সময় সময় কল্পনার চোখে দেখা বিষয় আর প্রত্যক্ষকে একই মনে হয়।

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ—কল্পনা সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট এ দুরকমের হতে পারে। সচেষ্ট কল্পনার উদাহরণ—টুনুর শীতকালে সকালে হঠাৎ আম খেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু তখন আর আম কোথায়? সে তখন কল্পনাতেই তাদের উঠোনের আমগাছকে ফলে ভরা দেখল আর পেড়ে খেতে লাগল। এখানে মন প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করে ঐ ভাবটা আনল। নিশ্চেষ্ট কল্পনার বেলায় যে চেষ্টা থাকে না তা নয়, তবে তা থাকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে। যেমন পড়তে পড়তে হঠাৎ মনের মধ্যে চলছে নানা বিষয়ের আনাগোনা। কখনও খেলার কথা, কখনও বা বেড়ানোর কথা।

সৃজনাত্মক কল্পনা আমাদের মন থেকেই কতকগুলো ছবি আঁকে। Creative Imagination সব সময়ই বাস্তবাভিমুখী হয় না। যখন বাস্তবাভিমুখী হয় তখন তাকে বলা হয় বাস্তব কল্পনা (Practical Imagination)। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তব কল্পনার উদাহরণ।

Receptive Imagination-এর ক্ষেত্রে কল্পনার একটা নির্দিষ্ট উত্তেজক থাকে। যেমন কৃষিবিষয়ক প্রদর্শনী দেখে এসে মনে মনে কৃষিবিদ হবার কল্পনা জাগে।

যে-সব কল্পনা বুদ্ধির বা জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় তাদের বলা হয় Intellectual Imagination. একটা অতি সামান্য বিষয়ের কল্পনা বহু সময় দার্শনিকের গবেষণার সূত্র হয়।

যে-কল্পনার আশ্রয় করে প্রতিমাশিল্পী দেবীর দেহ অপার্থিব রূপলাবণ্যে ভরে দেয় তা হচ্ছে Aesthetic Imagination.

বিষয়বস্তু হিসাবে আবার কল্পনা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি হয়। রাজার সোনার মুকুটের খাদ পরীক্ষা করতে গিয়ে আর্কিমিডিস

বিখ্যাত আপেক্ষিক গুরুত্বের সূত্র বার করেন। মহাশূন্যে ভাসমান গ্রহ উপগ্রহের কল্পনা বিজ্ঞানীদের মনে এনে দিল কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পনা। এ-সব বৈজ্ঞানিক কল্পনার উদাহরণ।

আবহাওয়া প্রতিকূল দেখে ধারণা হল যে ধান এবার হবে না, তাই কিছু ধান কিনে রাখা হল। এটা হল expectation; আবার আবহাওয়া অনুকূল দেখে ভবিষ্যতে ভালো ধান হবে, এই চিন্তাটা হল anticipation। এ দুটো এক ধরনের কল্পনা।

যে-কল্পনা করবার সময় আমাদের মন নিঃসীম শূন্যে পাখির মতো বাধা-বন্ধহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেটা হল মুক্ত কল্পনা (Free Imagination); আর যেখানে কল্পনা সহজ পথ পায় না পেয়ে নানা প্রতিকূলতার আবর্তে ঘোরে, সেটা হল Controlled Imagination.

Illusion, Hallucination, Dream এগুলো কল্পনারই শাখা-প্রশাখা।

যেমন :— বাপ্

কত বড় সাপ্
চোখ পাকিয়ে
আছে তাকিয়ে
ধরে গেল হাঁফ
ভয়ে দিনু লাফ
পিছলিয়ে সাঁত
ভুঁয়ে চিৎপাত।
ওরে মেজদাদা
আমি কি গাধা
পড়ে আছে সোজা
ছোড়দার মোজা
আরে রাম রাম
মিছেই ধড়াম।

এটা Illusion-এর উদাহরণ। Illusion-এর স্থায়িত্ব খুবই কম। যে-মুহূর্তেই খোকা বুঝল যে যাকে সে সাপ ভাবছিল সেটা আসলে ছোড়দার মোজা, সেই মুহূর্তেই illusion কেটে গেল। সাপের আকৃতি তার পরিচিত। মোজাটার সঙ্গে সাপের মিল দেখতে পেয়েই খোকার চোখে মোজাটা সাপ হয়ে গিয়েছিল।

একটা বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য-বোধ থেকেই illusion-এর জন্ম হয়। কিন্তু Hallucination এর উল্টোটাই হয়। সেখানে বস্তু বা বিষয়ের বালাই নেই। আপনা থেকেই ভাব এসে কল্পনাকে আশ্রয় করে। স্বপ্নে ডাকাতের হাতে পড়ে বিপর্যস্ত হওয়া এই ধরনের এমন ভাব হয় যে মনে হয় সত্যিই ডাকাতের হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। মনে প্রাণে ভয়। খুন হবার ভয়ে দৌড়তে পাচ্ছি না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুমণ্ডলী এই সময় আমাদের সহযোগিতা করে।

স্বপ্নও কল্পনারই অংশবিশেষ। দিবা-স্বপ্নে কল্পনার যোগ বেশী। দিবা-স্বপ্নে মন অল্প কল্পনায় মগ্ন থাকে। লটারিতে অনেক টাকা পেয়ে অনেক কিছু করব দৈবযোগে হঠাৎ বড়লোক হয়ে সকলের পুজো পাব এটা হল দিবাস্বপ্ন।

স্বপ্ন নানা রকমের হয়ে থাকে। মনের বিরুদ্ধে ইচ্ছে অনেক সময় স্বপ্নে রূপ পায়। অনেক সময় যে-কল্পনার সমাপ্তি হয় নি ঘুম এসে গেছে, স্বপ্নে সেই কল্পনার সমাপ্তি হয়।

কল্পনার উপযোগিতা—কল্পনা যে সব সময় কালই হরণ করে তা নয়, সুস্থ কল্পনার উপযোগিতা আছে। Creative Imagination আমাদের মনের সৃজনধর্মিতার পরিপোষক। বিজ্ঞানীর কল্পনা কত উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। শিল্পীর প্রেরণার মূলে আছে এই কল্পনা। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃত্য, সংগীত সমস্ত বিষয়ের গবেষণার মূলেই যেমন Intellectual Imagination, দেশের সমৃদ্ধি বা ব্যক্তিজীবনের সমৃদ্ধির মূলে তেমন Practical Imagination। Practical Imagination-ই জন্ম দিয়েছে ভাকরা নাঙ্গাল আর দামোদর বাঁধের, বিশাখাপত্তনের জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা সংঘাত আসে। আমাদের বহু বাসনা সেই সংঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। সেই অনন্ত বাসনা আমাদের অবচেতন মনের আঁধারে ডুবে যায়। সময় এবং সুযোগ পেলেই তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন আমাদের মন সেই সব বাসনা পূরণের কামনায় চঞ্চল হয়। নিরর্থক কল্পনায় হয়তো বিশেষ কোনো কাজই হয় না। কিন্তু হয়তো কারো মনে খুব লেখাপড়া শেখার শখ কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সে পূর্ণ হয় নি। কিন্তু অনবরত চিন্তা তার বড় হবার। এই চিন্তাই তাকে বড় হবার সময় ও সুযোগ খুঁজে দেবে।

আবার সমস্ত সময় সংসারের ঝামেলায় মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় নিভৃত অলস কল্পনা আমাদের শ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের থেকে অনেক বেশী কল্পনা করে। তখন তাদের মন থাকে কল্পনাপ্রবণ। শুধুমাত্র মা, বাবা আর পারিপার্শ্বিককে ঘিরে তারা প্রথমে কল্পনার জাল বুনতে থাকে। যতই তাদের বয়স বাড়তে থাকে ততই তাদের চোখ খোলে, তাদের কল্পনাতেও তখন পরিবর্তন আসে। তাই শিশুদের চরিত্রকে এমনভাবে দৃঢ় করতে হবে যে তারা সুস্থ কল্পনা নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। তবে একথা সত্যি যে অবান্তর ভীরু কল্পনাকে রুখতে না পারলে ভবিষ্যৎ ভালো হয় না। তবে ছোট বেলা থেকে যাতে শিশুরা ভালো কাজ করবার প্রেরণা পায় সেই ধরনের কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। Radio দেখে রঞ্জুর জানতে ইচ্ছে হয় Radioর কলা-কৌশল; তাকে যদি সে-সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে সেটা তার হৃদয়গ্রাহী হবে আর সে-সম্বন্ধে সে চিন্তা করে ভবিষ্যতে একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারে। কল্পনার বিশ্লেষণে দেখতে হবে, কল্পনা যেন মিথ্যাশ্রয়ী না হয়। পড়বার সময় হয়তো পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না, মনে মনে কল্পনা করল তার শরীর ভালো নেই, আজ যা হল না কাল সে শেষ করবে। কিন্তু পর দিনও অমন অজুহাত আসল। এ-ধরনের কল্পনা সুস্থ চিত্তের লক্ষণ নয়। কল্পনাকে যদি বাস্তবাভিমুখী করা যায় তাহলে সুফল পাওয়া যায়।

আমাদের জীবনে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা আমরা চিন্তা করতেও ভালোবাসি না। এর ফলে এই সব চিন্তা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে এমন কতকগুলো ক্রিয়া করে যার ফলে মনের বিকার ঘটে।

স্মৃতি ও কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই আমরা মানসিক ছবির (Imagery) উপর নির্ভর করি। স্মৃতির বেলায় আমাদের অভিজ্ঞতার সূত্রকে টেনে মনে করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কল্পনায় অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপকে ভিত্তি করে—রঙে রসে জাল বুনি।

কল্পনার বিকার—দেহ যাদের অসুস্থ, তাদের মনের মধ্যে বিকৃত কল্পনার জন্ম। দেহে মনে যারা দুর্বল জীবনের সংগ্রামের অগণিত বাধা-বিপত্তিতে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাধা বিপত্তিকে ভয় পেয়েই তারা মুসড়ে পড়ে, তাদের জয় করবার কল্পনা তারা আনতে পারে না। এই ভাবে নিরন্তর পিছিয়ে পড়ে জীবনের ক্ষেত্রে তারা পঙ্গু হয়ে পড়ে। জীবনের অতৃপ্তি অক্ষমতাকে ভুলতে চেষ্টা করে মানুষ আকাশ-কুসুম কল্পনার মধ্যে দিয়ে। অনেকে দিবারাত্র এই ধরনের কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে বিকৃতচিত্ত হয়ে পড়ে। তারা তখন আর সাধারণ সুস্থ মানুষের পর্যায়ে থাকে না। বিকৃত কল্পনা বিকৃত মস্তিষ্কের জন্ম দেয়। এই ধরনের অসুস্থ লোকদের অনেকের ধারণা হয় যে তারা আগে খুব বড়লোক ছিল। এই চিন্তা এদের মনে একটা স্থায়ী জটের সৃষ্টি করে।

এসব ছাড়া আমরা সাধারণ জীবনে দেখি, অনেকের বিদ্যা কিছুই নেই, তবুও সেই সব জিনিস নিয়ে তারা বড়াই করে। এর মূলে আর কিছু নেই, আছে শুধু মিথ্যা কল্পনা। জীবনের ক্ষেত্রে তারা সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে আছে, কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তারা নিজেদের বিদ্বান, অর্থবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। এই ভাবে তারা চিরকাল নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েই চলে।

আবার অনেকের জীবনে না চাইতেই সব পায়। তাদের মনে কোনো অতৃপ্তির সুযোগ নেই। তাদের মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা অস্বস্তি কিছুই থাকে

থাকে না। তখন তারা দুঃখের কল্পনা করেই আনন্দ পায়। ধনীর দুলালী নিজেকে গরিব ঘরের মেয়ে ভেবে তার দুঃখের ভাগ নিতে চায়। আবার অনেক সময় সকলের চোখে পড়বার জন্য মুখ ভার করে থাকে, ভাত না খেয়ে থাকে—সকলে যাতে তাকে এসে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করে, সাধাসাধি করে। অনেক সময় কাজে অসাফল্যের চিন্তা আমাদের এমন করে তোলে যে আমরা ব্যর্থতার কারণ চিন্তা না করে নিজের দোষ অপরের ওপর চাপিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার মূলে নিজের ত্রুটি না দেখে পারিপার্শ্বিকের ওপর সব ত্রুটি চাপিয়ে দিই। পরাজয়ের অগৌরবের গ্লানি ঢাকবার জন্য আমরা মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় নিই।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে অনেকে নিজেদের অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মনে করে। তারা যা করে তাই ঠিক, আর অন্য সকলে যা করে তাই ভুল এই ধরনের চিন্তা যখন অত্যধিক মাত্রায় হয় তখনই মানসিক বিকার দেখা যায়।

Illusion, hallucination, day dreams—এসবগুলিও মনের বিকৃত কল্পনা।

মনের ভুল ধারণা বা সুস্থ কল্পনার অভাব স্নায়ু-বিকারের কারণ। আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে সেই সমস্ত ঘটনার চিন্তা করতেই আমাদের লজ্জা বা দুঃখ হয়। সেই সব ঘটনা আমরা চেপে থাকি। অবচেতন মনে তারা নানা জটের সৃষ্টি করেও আমাদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় যে তারা ভুল বিশ্বাস নিয়ে এমন ভাবে বসে আছে যে তাদের সেই বিশ্বাস থেকে নড়ানো যায় না। ভ্রান্ত চিন্তা তাদের মনে এমনভাবে নিজের বাসা বেঁধে তাদের দুর্বল করে ফেলে যে তখন তারা ভ্রান্ত চিন্তারই দাস হয়ে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে মানুষের নিরুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বহু কাজ মানুষ লোক-লজ্জার ভয়ে বা অন্য নানা কারণে প্রকাশ্যে করতে পারে না। সেই সব ইচ্ছা চেতন-মানসের অন্তরালে জেগে থাকে। ঘুমের মধ্যে তারা অবচেতনের

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে। যাদের মনে এই নিরুদ্ধ ইচ্ছার সংখ্যা বেশী তারাই অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। আপাতদৃষ্টিতে ঐ সব স্বপ্নের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন ঐ সব স্বপ্নের রহস্য উদঘাটন করলে অবচেতন মনের বহু জট খোলা যায়।

নবম অধ্যায়

শিক্ষা-রীতি

শেখা কাকে বলে—সাধারণভাবে আমরা নতুন কিছু জানাকেই শেখা বলি। কিন্তু শেখার বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

Associationistরা বলেন, যখন মনের সামনে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা আসে তখন মন তার পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুনের একাত্মতা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। তাঁদের মতে মন পুরনো সব অভিজ্ঞতার কথা ভাবে না, কেবলমাত্র নতুনের সঙ্গে মিল আছে এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলোর কথাই ভাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে আমাদের মনের চিন্তাগুলো সব একসঙ্গে জট পাকিয়ে আছে। কিন্তু আসলে তা নয়; বইএর তাকে বিষয় হিসেবে সাজানো বইএর মতোই মনের চিন্তাগুলো সাজানো থাকে। তাই কোনো নতুন জিনিস দেখলে সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলো মনে এসে যায়।

শেখা যায় তখনই যখন মন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরনো অভিজ্ঞতার সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারে। যখন কোনো অপরিচিত লোক আমাদের সামনে আসে তখন আমরা তার সঙ্গে পূর্বপরিচিত কোন লোকের মিল খুঁজবার চেষ্টা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অমিলটুকুর দিকেও নজর দিই। এই প্রক্রিয়াতে আমাদের নতুন বিষয়ের জ্ঞানও হল, পুরনো বিষয়ও আবার

মনে করার জন্য ভালো করে জানা হল। এই প্রক্রিয়া Process of apperception নামে পরিচিত।

খুব ঘন বর্ষার দিনে দিল্লী গেলাম, তাই দিল্লী ভিজে জায়গা এই ধারণাই হল। আর বৃষ্টির সঙ্গে আমার দিল্লী যাবার একটা সম্পর্ক হয়ে গেল। খুব বৃষ্টি হলেই দিল্লীর কথা মনে পড়ে। এটা নেহাতই আকস্মিক ব্যাপার। কারণ দিল্লীর আবহাওয়া শুকনো। আর খুব বেশী রকমের বৃষ্টি সেখানে হয় না, আমি যেদিন গেছি সেদিনই হয়তো হঠাৎ ঐ রকম বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দিল্লী সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছে ব্রহ্মের আকিয়াব বা মৌলমিনেরই মতো, সেখানে শুকনো দিনের দেখা মেলাই ভার। আকস্মিক যোগাযোগের জন্য আমার ধারণাটা ভুল হয়েছে। আমাদের বহু ধারণাই এই ভাবে মিথ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

এই যোগাযোগ সব সময়েই আকস্মিক হয় না। অনেক সময় আমরা যুক্তি দিয়ে নতুন আর পুরনোর মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করি। যেমন দিল্লীর জলবায়ুর কথা ভাবতে গেলেই আমাদের মনে আসে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কথা। কারণ এই অঞ্চলও গ্রীষ্মে বৃষ্টিহীন, আবহাওয়া উগ্র নয়, নাতিশীতোষ্ণ। একই ধরনের ফল সেখানে জন্মায়। এই ভাবে আমরা আমাদের পূর্বপরিচিত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর সঙ্গে চিলির তুলনাত্মক আলোচনায় নতুন জিনিসও শিখলাম এবং পুরনো জিনিসকে নতুনের পটভূমিকায় এনে জানলাম।

Associationist-দের মতে, যোগাযোগটা যতই স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ হবে শেখাটা ততই সুষ্ঠু হবে।

আচরণবাদীর মতামত—Associationistরা শিক্ষার্থীর থেকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর ওপরই বেশী জোর দেন। কিন্তু আচরণবাদীরা বিষয়বস্তুর চেয়ে শিক্ষার্থীর বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেই দিকেই বেশী জোর দেন।

যখন কোনো নতুন জিনিস কারোর সামনে উপস্থাপিত হয় তখন তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যতক্ষণ এই প্রতিক্রিয়াটা এলোমেলো

ভাবে হয় এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল না মেলে ততক্ষণ শেখা হয় না। Behaviourist-দের শেখাটা হচ্ছে শিক্ষার্থীর বারে বারে ত্রুটিমুক্ত এবং সুবিন্যস্ত প্রতিক্রিয়া। আচরণবাদীরা স্বয়ংক্রিয় ও সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি প্রভেদের সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া যেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ নেই বললেই চলে। প্রতিক্রিয়াটা সেখানে যান্ত্রিকভাবেই ঘটে। যেমন চোখের পাতায় হাত লাগলেই চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে। স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার পিছনে কোনো বিশেষ প্রস্তুতি থাকে না। এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর মতে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন-সাপেক্ষ। তাঁদের মতে সেই সব প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করা যায় যেখানে প্রতিক্রিয়ার পিছনে প্রস্তুতি থাকে। যেমন ভালো খাবারের নাম শুনলে অনেকের জিভে জল আসে। আমাদের মুখের লালারস খাবার পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয়। খাবার মুখের মধ্যে গেলেই তবে লালারস নির্গত হবার কথা। এই প্রতিক্রিয়া অভ্যাস দিয়ে এমনই করা হয়েছে যে খাবার মুখে পৌঁছবার আগেই শুধু তার নাম শুনেই জিভে জল আসে। এখানে এই প্রতিক্রিয়ার পেছনে আছে প্রস্তুতি।

এর থেকেই আচরণবাদীরা বিখ্যাত Conditioned Response thecryতে উপনীত হয়েছেন। এ-সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী পাভলভ একটা পরীক্ষা করেন। তিনি প্রত্যহ একটা কুকুরকে এক ডিশ মাংস দিতেন ও মাংসটা দেবার ৩০ সেকেণ্ড আগে একটা ঘণ্টা বাজাতেন। এই ভাবে কুকুরটা যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠল তখন একদিন তিনি ঘণ্টা বাজালেন, কিন্তু খাবার দিলেন না। ঘণ্টা বাজিয়েই তিনি কুকুরের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন ঘণ্টা শুনে তার জিভে জল আসে নি তবে ঘণ্টা শুনে সে খাবার আসবার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েছে। তার জিভে জল এল ঘণ্টা বাজার ৩০ সেকেণ্ড পরই, ঠিক তার খাবার দেবার সময়ে। দুটো উত্তেজকের সাহায্যে সে তার প্রতিক্রিয়াকে ঠিক সাজিয়ে নিয়েছে। একটা হচ্ছে ঘণ্টাটা; ঘণ্টা

শুনলেই সে সচেতন হচ্ছে আর ৩০ সেকেণ্ড সময়টা পার হলেই তার প্রতিক্রিয়া (জিভে জল) দেখা দিচ্ছে।

Conditioned Responseএ যারা বিশ্বাসী তাঁদের মতে শিক্ষাটা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার conditioning; অর্থাৎ কৃত্রিম উত্তেজকের সাহায্যে একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা। পাভলভএর পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি জিভে জল পড়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে কৃত্রিম উত্তেজকের সাহায্যে ঘটানো হয়েছে।

এই মতবাদের সমর্থকরা বলেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উত্তেজকের সৃষ্টি করে আমরা অভীপ্সিত ফল পেতে পারি। ছোটদের আরশোলা বা মাকড়সাতে ভয় থাকে। এর মূলে আছে ওদের কারসাজি। ছোট অবস্থায় তাদের ঐ সব জীবের প্রতি একটা ভয়ের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে ঐ সব জীবরা মোটেই ভয়াবহ নয়, তবুও তাদের কৃত্রিম উত্তেজক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের মতে শিক্ষকরা ইচ্ছা করলে বিষয়ানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়াটি পেতে পারেন। এই ভাবে বারে বারে অভ্যাস করিয়ে কোনো উত্তেজকের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াটি এমন ভাবে ঠিক করা যায় যার ফলে শেষে তাকে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া বলে ভুল হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শেখার মূলে রয়েছে অভ্যাস। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করা আর ঐ প্রতিক্রিয়াটা যাতে মনে গেঁথে যায় সেজন্যে বারে বারে অভ্যাস করানোও শিক্ষকদের কাজ।

থর্নডাইকের নীতি—আচরণবাদীদের মতো থর্নডাইকও শেখাকে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি উত্তেজকই যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তার কোনো মানে নেই। যে-সব বিষয় তার আনন্দের কারণ হবে বা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করবে সেই সব বিষয়ক উত্তেজকই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। শেখার মূলে আছে তৃপ্তি। যে-কাজ বা যে-বিষয় ভালো লাগবে না সে-সব বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগবে না।

কিন্তু যে-সব বিষয় আমরা ভালোবাসি এবং যে সব কাজ আমাদের তৃপ্তি দেবে সেই সব বিষয়েই আমাদের প্রতিক্রিয়া জাগবে। যে-সব কাজের ফল আনন্দ-দায়ক সেই সব বিষয়ের উত্তেজকই ব্যক্তির মনে ঠিক প্রতিক্রিয়া জাগাবে।

থর্নডাইক আরও বলেন যে উত্তেজক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সম্পর্কটা স্থাপিত হলেই শুধু চলবে না। বারে বারে অভ্যাস করে সম্পর্কটাকে স্থায়ী করতে হবে। কারণ অভ্যাস যতই করা হবে শেখাটাও ততই ভালো হবে। উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি 'trial & error' পদ্ধতির কথা বলেন। একটা বাক্সে একটা ইঁদুরকে বন্দী করে রাখা হল। বাক্সের কোথাও কোনো ফাঁক নেই, শুধু ওপরে একটা ফুটো আছে। সে ক্রমাগতই চেষ্টা করবে ঐ ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসতে। প্রথমবারে বেরোতে তার বেশ কয়েক বার চেষ্টা করতে হল। বেরোবার পর তাকে আবার যখন বাক্সে পোরা হল তখন তার আর আগের বারের মতো বেরোতে দেরি হল না। একবার চেষ্টার পরই বেরিয়ে এল। এই ভাবে বারে বারে করার পরে তার এমন একটা অবস্থা আসবে যখন তার আর চেষ্টার দরকার হবে না—বাক্সে ঢুকলেই বেরিয়ে আসবে।

প্রথমবারে বাক্সে ঢুকে ইঁদুরটা নানা জায়গা থেকে বারে বারে লাফালাফি করল বেরিয়ে আসার জন্য। বারে বারে তার ভুল হতে লাগল। সে বুঝতে পারল এভাবে সে সফল হবে না। এই রকম করে বহু ভুল করে সে শেষে বেরিয়ে আসার ঠিক প্রক্রিয়াটি বার করল। এটা হল তার ঠেকে শেখা। সে বারে বারে ভুল করে, সেই ভুল ঠিক করে সঠিক প্রতিক্রিয়াটির সৃষ্টি করতে পারল। আগের সব চেষ্টাগুলোই তাকে কোনো সুফল দিচ্ছিল না, তাই তাতে সে উৎসাহ বা আনন্দ পাচ্ছিল না। শেষের চেষ্টার ফল হল শুভ, তাই ঐ প্রতিক্রিয়াটা তার মনে জেগে রইল। শেষের বারে প্রচেষ্টাটা তাকে মুক্তির স্বাদ এনে দিল, সেটা তার পক্ষে আনন্দদায়ক। তাই দ্বিতীয় বার তাকে যখন বাক্সে বন্দী করা হল হল তখন সে ঐ আনন্দদায়ক ফললাভের জন্যেই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল।

কিন্তু যদি বেশ কিছু দিন বাদে আবার ইঁদুরটাকে বাক্সে বন্দী করা যায় তাহলে হয়তো তাকে আবার বারে বারে লাফালাফি করে সঠিক প্রতিক্রিয়াটা খুঁজে বার করতে হবে। তবে প্রথমবারে তাকে যতবার চেষ্টা করতে হয়েছে পরের বার তাকে তার চেয়ে কম বার চেষ্টা করতে হবে।

এইভাবে থর্নডাইক শেখার সম্পর্কে যে-কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেন তার আলোচনা আগেই করেছি।

এখানে তিনি Conditioned Reflex theoryর অনুগামীদের অব্যক্ত বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। সঠিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য উত্তেজকের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁর মতে বাঞ্ছনীয়।

সমগ্র-বাদীদের মতামত—কোয়হলার, কফ্কা প্রভৃতি Gestalt মনোবিজ্ঞানীদের মতে মনের ক্রিয়াগুলির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বিন্যাস ও গঠন আছে। এঁরা কোনো বিষয়কে খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন রূপে দেখতে চান না। সমস্ত বিষয়টার একটা সমগ্র রূপ এঁরা মনের সামনে তুলে ধরেন। যখন আমরা কোনো একটা জিনিসের দিকে লক্ষ্য করি তখন আমরা সাময়িক ভাবে হয়তো সেই জিনিসে বেশী মনোযোগ দিয়েছি, কিন্তু বিষয়টার পটভূমি বা পারিপার্শ্বিক আমাদের চোখে একেবারে ম্লান হয়ে যায় নি। সেই রকম কোনো বিশেষ চিন্তা বিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের মনে আসে না। যখন আমরা কোনো কবিতা পাঠ করি তখন তার প্রতিটি শব্দ বা পঙক্তি বিশেষ ভাবে পড়ি না, সমস্ত পদ্যটাকে একক ভাবেই পড়ি এবং সমস্ত কবিতাটার সম্বন্ধে একটা ধারণা করি। যদি আমরা কোনো একটা লাইন বা স্তবক ভুলে যাই, আর কেউ যদি সেটা মনে করিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ সমস্ত কবিতার সারটুকু আমাদের মনে জেগে ওঠে। গেস্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতার শব্দ ও লাইনগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা সূত্রের সৃষ্টি করে। তাই সেই সূত্রের ভুলে-যাওয়া এক অংশ মনে করিয়ে দিলেই সমস্ত কবিতাটা মনে জেগে ওঠে।

এঁরা থর্নডাইকের শেখার চারিটি সূত্রের সঙ্গে একমত নন। থর্নডাইক শেখার মূল খোঁজেন উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে। তাঁর মতে

প্রত্যেক উত্তেজকেরই একটা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। গেসটাণ্ট মতবাদীরা এ ধরনের স্থত্রে বিশ্বাসী নন। যখন আমরা কোনো বিশেষ ভাবের সম্মুখীন হই মন তখনই সমস্ত অবস্থার একটা প্রতিক্রিয়া বের করে ফেলে। সমগ্র-বাদীদের মতে যে-বিষয়গুলোর ওপর আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সে-বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনই শিক্ষা।

ডিউয়ির অভিমত—ডিউয়ি ও তাঁর অনুগামীরা বলেন যে শেখা সম্ভব হয় সেখানেই যেখানে সে-সম্পর্কে আর্তি জাগে। তাঁর মতে শেখামাত্রই উদ্দেশ্যমূলক এবং যে উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় শেখাতেও হয় সেই উপায়ে। সাধারণতঃ যখন আমরা বাড়ির পাঁচিল ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা দেখি তখনই পাঁচিলের সব ফাটলগুলো আমাদের চোখে পড়ে। ছুটো ক্ষেত্রেই আমাদের স্থক্ষ্ম মনঃসংযোগ দেখা যায়। শেখাটা হয় ঠিক এই রকমেই। যখন কেউ কোনো বিষয় শেখে তখন সে সেই বিষয়ে একাত্ম হয়ে যায়। শেখার সময় ছেলেদের মন জয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। শেখাতে আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যাতে আমাদের দেহ-মন একান্ত সেই কাজের জন্য উৎস্থক হয়ে পড়ে। ঠিক এই ধরনের অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সম্ভব হয়। তাই সেখানেই সবচেয়ে বেশী মাত্রায় শেখাটা হয়। একে তিনি বলেছেন Primary learning.

ডিউয়ি বলেছেন যে সবখানেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব নয়।

তিনি আর এক ধরনের শেখার কথা বলেছেন। অধীত বিষয় থেকে নানা সমস্যা অনেক সময় উদ্ভূত হয়। এর সমাধানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্তি জাগাতে হবে।

থর্নডাইকের মতো ডিউয়িও প্রস্তুতির স্থত্রে (law of readiness) বিশ্বাসী।

পারিপার্শ্বিককে জয় করবার জন্য প্রাণীরা যে-উপায়ে যা শেখে সেটা ভবিষ্যৎ শিক্ষার পাথেয় রূপে তাদের ভেতর জমা থাকে। ফলে নতুন কিছু শেখার সময় প্রথমে যে-সময় নষ্ট হয় তা অনেকাংশে কমে যায়।

সারসংক্ষেপ—Associationistদের মতে নতুন কিছু শেখার সময় তার সঙ্গে যদি পুরনো শেখা জিনিসের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহলে শেখাটা সহজ হয়। এর ফলে শুধু যে পুরনো জিনিস ঝালানো বা নতুন জিনিস শেখাই হয় তা নয়, পুরনো জিনিসকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। তাঁরা বলেন এই ধরনের যোগটা আকস্মিকভাবেও হতে পারে, আবার সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমেও ঘটতে পারে। তাঁরা পরিকল্পিত যোগাযোগের ওপরই বেশী আস্থাবান।

আচরণবাদীদের এক দলের মতে শেখাটা হয় উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের পর বারে বারে সেই কাজটাই করার মধ্যে দিয়ে। এদের মতে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখানি। শিক্ষকেরা পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপিত করবেন যাতে তা ঠিক প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল হয়। বারে বারে ঐ একই কাজ করিয়ে শেখাকে দৃঢ় করবেন। এঁরা Conditioned Reflex theoryতে আস্থাবান।

থর্নডাইক স্বীকার করেছেন যে অন্ধভাবে ভুল করে করে ঠিক জিনিসটি শেখা যায়। কিন্তু এই অন্ধভাবে কাজ করার মধ্যে একটা প্রেরণা থাকে। যে-কাজের ফল আমাদের প্রয়োজনীয় বা আনন্দদায়ক সেই কাজের জন্য আমরা বারে বারে চেষ্টা করি। এইভাবে শেখার মধ্যে মনের দিক থেকে যে একটা প্রস্তুতি থাকে থর্নডাইক সেটাকে বলেছেন প্রস্তুতির সূত্র বা Law of readiness। পুনরাবৃত্তির যে একটা প্রয়োজন আছে সেটা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে পুনরাবৃত্তি ও কাজটা নতুন করে করার মধ্যের সময় যতই কম হবে শিক্ষণীয় বিষয়টি তত ভালোভাবে মনে গাঁথা থাকবে। যদি এই সময়ের ব্যবধান খুব বেশী হয় তবুও প্রথম বারে করার মতো অত সময় লাগবে না।

কোয়হলার ও কফকা প্রভৃতি সমগ্রবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে শেখাটা বিশেষ থেকে সমগ্রের দিকে যাওয়া নয়। এটা সমগ্র থেকে বিশেষে যাওয়া। সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্কটা সেটা যখনই ব্যক্তিমানসে ধরা পড়ে, তখনই হয় অন্তর্দৃষ্টি-লাভ। প্রকৃত শেখাটা হয় তখনই।

Dewyর মত কিছুটা থর্নডাইকের মত ও কিছুটা Gestalt মনোবিজ্ঞানীদের মত। তাঁর মতে কাজের মধ্যে আনন্দ বা প্রীতির যে-সম্পর্ক সেটা শুধু ফল লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে-কাজটা করতে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা তাড়াতাড়ি শেখা যায়। Gestaltদের মতো তিনি সমগ্রতা মতবাদেও বিশ্বাসী। তবে তিনি বলেন সমগ্রের ওপর দৃষ্টি দিলেও সমগ্রের বিশেষ অংশ থেকে সমগ্রের দিকে অগ্রসর হতে হয়। যেমন সৈন্যরা যখন দুর্গ দখল করার সিদ্ধান্ত করে তখন তাদের দৃষ্টি থাকে সমস্ত দুর্গ জয়ের দিকে, কিন্তু তারা অগ্রসর হয় দুর্গের একটা বিশেষ অংশ থেকে। তিনি তিন রকম Primary learning-এর কথা বলেছেন।

শেখার পেছনে একটা আর্তি থাকে। ধরা যাক একটা ক্ষুধার্ত ইঁদুরের সামনে যদি কিছু খাবার দেওয়া যায় তবে সে লাফিয়ে সেটা খেতে যাবে। কিন্তু যদি তার খিদে না থাকে তবে সে খাবারের সামনে ঘুমিয়েও পড়তে পারে। তাই শেখার পেছনে একটা প্রেরণা থাকা চাই। তা না থাকলে শেখা যায় না।

শেখার মূলে কিছু প্রতিবন্ধক রাখতে হবে। কারণ না ঠেকলে শেখা যায় না। ইঁদুরের মুখের সামনেই যদি খাবারটা রাখা যায় তবে তার কিছুই শেখবার নেই। কিন্তু যদি তাকের ওপর থালার নিচে খাবার রাখা যায় তাহলে সে তাকে উঠে বা থালা তুলে খেতে শিখবে। তাই শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধক থাকবে। আর সেই প্রতিবন্ধকটা শিক্ষার্থীকে অনুভব করতে হবে।

বারে বারে ভুল করেও ঠিক কাজটা করাই হচ্ছে মূল কথা। প্রথম বার কাজটা করার সময় সেটা হয় এলোমেলো ও অসংলগ্ন। এটা কেবল ইতর প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় না, মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যে ইঁদুরের প্রথম প্রথম যে-রকম এলোমেলো চেষ্টা থাকে প্রথম গাড়ি চালানো শেখার সময় ঠিক তেমনি এলোমেলো ষ্টীয়ারিং ঘোরানো হয়।

বারে বারে করে বা ঠেকে শিখে বা অন্যের নির্দেশনায় কাজটা করলে ফললাভ হয় ঠিকই, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত সমগ্র বিষয়টি শিক্ষার্থীর চোখে ধরা পড়ে না। অন্তর্দৃষ্টিটা আসে হঠাৎ-পড়া আলোর মতো। সেটা আকস্মিক।

অন্তর্দৃষ্টির ভেতর দিয়ে যে-শেখাটা হয় সেটা হয় তাড়াতাড়ি। আর বারে বারে করা ও ঠেকে শেখার মধ্যে দিয়ে যেটা আসে তাতে একটু সময় বেশী লাগে।

শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি শেখাকে বাধা দেয়। সেজন্য বিশ্রামের প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি ভালো ফল দেয়। কোনো একটা বিষয় সপ্তাহে প্রতি দিন একবার করে পড়লে যে-ফল দেবে সপ্তাহে একদিনে ঐ সময়টা দিলে ফল কম হবে।

শেখার ক্ষেত্রে বয়স ও তদনুযায়ী ক্ষমতার পরিমাপের প্রয়োজন আছে। যে-বয়সে যেটুকু সম্ভব সেটুকু করানো উচিত। বেশী মাত্রায় করতে গেলে ভালো ফলের আশা কম।

শিক্ষকের কাজ—আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে নতুন কিছু শেখার কাজে শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকের দায়িত্বটাই বড়। নতুন জিনিসকে শিক্ষার্থীর সামনে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যে তা যেন শিক্ষার্থীর কৌতূহল জাগায়। এই কৌতূহলের নিবৃত্তিই শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাবে জ্ঞানের বিভিন্ন লোকে।

শেখানোর সময় প্রথমেই শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থীর কিসে রুচি, কোন ধরনের বিষয় সে ভালোবাসে। যে সব বিষয় সে ভালোবাসে প্রথম প্রথম সেই সব বিষয়ই তাকে শেখাতে হবে। কারণ দেখতে হবে যে তার শেখাটা যেন আনন্দের মধ্যে দিয়ে হয়। কেউ হয়তো বিজ্ঞান ভালোবাসে তাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রভৃতির মাধ্যমে বহু কিছু শেখানো যায়। সেজন্য শিক্ষার্থীর মনের প্রকৃতি জানবার চেষ্টা করা শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।

তবে শুধু রুচির উপর নির্ভর করে শেখাতে গেলে শিক্ষাটা একদেশদর্শী হয়ে যেতে পারে। তাই যে-সব বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি নেই সেই সব বিষয়ে রুচি সৃষ্টির দায়িত্বও শিক্ষকের হাতে। যে-সব বিষয় শিক্ষার্থীর ভালো লাগে না সে সব বিষয়কে শিক্ষকের এমন চিত্তাকর্ষক করে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন আপনা থেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠে। অঙ্ক করতে হয়ত একজনের ভালো লাগে না কিন্তু তাকে নানা রকম খেলার মাধ্যমে, কাঠের টুকরো, প্রভৃতি দিয়ে অঙ্ক করালে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে সে-সব চলে ছোটদের বেলায়। বড়দের বেলায় অঙ্ক না পারলে তার ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধে সচেতন করলে ভালো হয়। অঙ্ক না পারলে বার্ষিক পরীক্ষার ফল ভালো হবে না। পরে বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই পড়বার সুবিধে হবে না। অনুরূপ চিন্তা শিক্ষার্থীদের মনে উৎসাহ জাগাবে। এ ছাড়াও যদি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলেও ফল ভালো হয়। তবে পুরস্কারের লোভটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রেষারেষির সৃষ্টি করে। পুরস্কারের যেমন একটা দিক আছে সম্মানের লোভ, তেমনি অনেক সময় তিরস্কারেও কাজ হয়। তিরস্কারের অসম্মান থেকে দূরে থাকবার চেষ্টাও শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলে।

শেখাবার সময় শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বাস্থ্য কেবল মাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈহিক স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দৈহিক স্বাস্থ্য খারাপ হলে বেশী সময় পরিশ্রম করা সম্ভব হয় না। দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ভালো খাবার, ব্যায়াম ও বিশ্রামের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও তেমনি নানা রকম আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন। মনে চিন্তার বোঝা নিয়ে বসে থাকলে কোনো কিছুতে মন দেওয়া যায় না। মনকে সতেজ, ক্লান্তিশূন্য ও স্থির রাখতে হবে, শিক্ষক তাই একই সঙ্গে অনেক কিছু শেখাবার চেষ্টা করবেন না। শেখাবার মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে উন্মুখ করে নিতে হবে। বিরামের প্রয়োজন শুধু মাত্র এই দিক

থেকেই নয়। শেখার মাঝে বিরাম দিলে একঘেয়েমি থাকে না, আর যে-বিষয়টা শেখানো হচ্ছে সেটাও মনের মধ্যে থাকবার সুযোগ পায়। ছোটদের সেইজন্য কখনই অনেকক্ষণ ধরে একই জিনিস করানো উচিত নয়।

কোনো জিনিস শুধু একবার শিখে রাখলেই চলে না তার জন্য চাই অভ্যাস। অভ্যাস না করলে অর্জিত জ্ঞান অব্যবহৃত ছুরির মতোই মরচে পড়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে শেখা জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। পাঠশালায় নামতা পড়া রোজই হয়। এতে নামতা ছাত্রদের মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে তারা সহজে তা ভোলে না। তাই শিক্ষককেও শেখানো জিনিস মাঝে মাঝে অভ্যাস করাতে হয়।

শেখাবার সময় শিক্ষার্থীর বয়সটার দিকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়সোপযোগী জিনিস যদি শিক্ষার্থীদের মনের মতন করে তাদের সামনে সাজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে শেখাবার সাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকবে না। সেজন্য কোন বয়সের পক্ষে কোন জিনিসটা দরকার বা কোন বয়সের ছেলেরা কী ধরনের বিষয় গ্রহণে সমর্থ হবে, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখতে হবে।

নতুন কিছু শেখাবার সময় সমস্ত বিষয়টা একসঙ্গে না শিখিয়ে ভেঙে ভেঙে শেখালে বেশী উপকার হয়। যেমন বড় একটা কবিতা যদি একসঙ্গে মুখস্থ করতে কাউকে দেওয়া যায় তাহলে সে বিব্রত হবে। ছোট ছোট ভাগ করে শিখলে শেখাটাও ভালো হবে। তাই শিক্ষক কখনই একগাদা পড়া বা কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীকে ভারাক্রান্ত করবেন না। সে তার মন নিয়ে যতটুকু শিখতে পারে ততটুকু দেওয়া উচিত। তাতে কাজ অল্প হবে, কিন্তু কাজটা ভালো হবে, এইজন্য একটা কাজ যদি শিক্ষকের একদিনেই করাবার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তিনি সেটা একবারে একসঙ্গে না করিয়ে তিনবারে বা চারবারে করাবেন।

ছোটদের পক্ষে জোরে জোরে পড়লে পড়াটা ভালো হয়। এতে ইন্দ্রিয় যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং পড়াটা সহজেই হয়ে যায়। কেননা ছোটদের মন

স্বভাবতঃ চঞ্চল। মনে মনে পড়লে বইএর পাতা থেকে মন অন্যদিকে চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকতে হবে। শিক্ষকের সামান্য ভুল শিক্ষার্থীর জীবনে অনিষ্ট ঘটাতে পারে, আবার তাঁরই সতর্ক দৃষ্টি তাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারে।

দশম অধ্যায়

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ

প্রত্যেক জীব তার জন্মক্ষণে কতকগুলো বিশেষ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। যেমন জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি। এ-প্রবৃত্তির প্রকাশ জীবের জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায়। আমরা আমাদের পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকেই কাজ করি। কিন্তু নবজাতকের অভিজ্ঞতার অবকাশ কোথায়? সেইজন্য তার সেই কাজের ব্যাখ্যা হয় মূলগত সংস্কার দিয়ে। মূলগত সংস্কারের পেছনে কোনো রকম অভ্যাস নেই বা অভিজ্ঞতা নেই। আপনি-আপনিই তা ঘটে। জীব-জগতের এক-এক শ্রেণী এক-এক ভাবে আপন সংস্কারের প্রকাশ করে যায়। প্রত্যেক শ্রেণীরই সংস্কারের প্রকাশ একই ধরনের। তার মধ্যে কোনো হের-ফের নেই। তাই সংস্কারকে বদলানো বিশেষ সম্ভবপর হয় না। সংস্কারের প্রকাশে প্রাণীরা যন্ত্রচালিতেরই মতো কাজ করে। তাতে কোনো বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না বললেই চলে। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পরিবেশকে একটু ওলট-পালট করে দিলেই তারা কিছুই করতে পারে না। কিন্তু সংস্কার দিয়ে যে-সব কাজ হয়ে থাকে সেগুলো সুন্দর আর পরিপাটি হয়। তার পেছনে যে শিক্ষা নেই বা বুদ্ধি নেই তা বোঝানো ভার। বাবুই পাখির বাসা দেখলে মনে হয় যেন কত পটু হাতের কাজ। সহজাত সংস্কারগুলো

সুপ্ত অবস্থায় সব সময় জীবের অন্তরে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে তার স্ফুরণ হয়। কোনো পাখিকে জন্মের পর থেকেই খাঁচায় পুরে রেখে বেশ কিছুদিন বাদে তাকে ছেড়ে দিলে সে একেবারেই উড়তে পারবে না এমন নয়। একটু উড়তে সে পারবে। কেননা ওড়বার কায়দা সে ভুলে যায় নি। শুধু অনভ্যাস তার ওড়ার পথে বাধা হচ্ছে।

নিম্নস্তরের জীবেদের মধ্যে ও উচ্চস্তরের জীবের শৈশবে বুদ্ধি-বিবেচনার স্থান নেই। তাই প্রকৃতি সেখানে তাদের বাঁচবার অবলম্বন হিসাবে তাদের দিয়েছে তাদের মধ্যে সংস্কারের বীজ। তাই নিম্নস্তরের জীবেরা আহার অন্বেষণ, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করে মূলগত সংস্কারের বশে। কতকগুলো সংস্কার মানুষের মধ্যে প্রায় সমস্ত জীবন ধরে থাকে, আবার কতকগুলো সংস্কার আয়ুষ্কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মূলগত সংস্কার সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের বাকবিতণ্ডার শেষ নেই। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী সংস্কারকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাণীদের সংস্কারের মধ্যে যে জন্ম-জন্মান্তরের ছাপ আছে সেটা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ক্রমবিবর্তনের পথে এককোষী জীব আজ মানুষে পরিণত হয়েছে। পরিণতির পথে জীবদেহে নানা পরিবর্তন হয়, যেমন কোষ বৃদ্ধি, নানা রকম অস্থি গ্রন্থির সমাবেশ ইত্যাদি। দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও ব্যবহারের জগতেও পরিবর্তন এসেছে। আচরণবাদীরা প্রাণিজগতের reflex জাতীয় ব্যবহারকে সংস্কার বলেছেন। তাঁদের মতে সংস্কার কতকগুলো reflex-এর সমষ্টি। Reflex হচ্ছে সেই ধরনের ব্যবহার যার মূলে বুদ্ধি-বিবেচনার অবকাশ নেই। সেগুলো খুবই তাড়াতাড়ি হয়। যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকে চোখ বন্ধ করা।

সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ—সাধারণতঃ সংস্কারের পরিবর্তন বিশেষ হয় না। কারণ সংস্কার জন্মগত। তবে আমাদের প্রায় সব কাজের ওপরই বুদ্ধি বিবেচনার বেশ কিছু আধিপত্য আছে। প্রয়োজন বিশেষে আমাদের মন সংস্কারের প্রকাশে বাধা ও উৎসাহ দেয়। আমরা যতই

উন্নত হচ্ছি ততই আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছি। হাসিটা আমাদের অন্যতম প্রবৃত্তি। কিন্তু এমন বহু জায়গা আছে যেখানে আমরা প্রাণখুলে হাসতে পারি না। সেখানে আমাদের হাসির প্রবৃত্তিকে আমরা দমন করি। আদিম যুগের মানুষের কথা ভাবলে আমরা শিউরে উঠি। তারা বন্য পশু হত্যা করে পুড়িয়ে আধকাঁচা অবস্থাতেই রাক্ষসের মতো খেত। তার কাছে তখন মা, বাবা, ভাই, বোন কেউ আপন হত না। আহার্যের ভাগীদার সে সহজে কাউকে করতে চাইত না। ক্ষুন্নিবৃত্তির সেই আদিম প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যেও আছে, কিন্তু ঐ রকম করে তার প্রকাশ করতে আমরা লজ্জা পাই।

আদিম মানুষ ক্রোধের প্রকাশ করত ভীষণভাবে। কিন্তু বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশকে মার্জিত করার একটা সযত্ন প্রচেষ্টা রয়েছে। ইতর প্রাণীদেরও সংস্কারের পরিবর্তন শিক্ষা দিয়ে করানো যায়। সাধারণ বেড়াল মাছই ভালোবাসে। তাকে আমরা নিরামিষের পরিবেশে রেখে নিরামিশাষী করতে পারি। বাঘের ধর্ম প্রাণী হত্যা ও তার মাংস খাওয়া। এই জন্য শিকারীরা বনের মধ্যে ছাগল বা তার পূর্ব রজনীর অর্ধভুক্ত প্রাণীটিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আড়ালে গা ঢেকে থাকে। কিন্তু চতুর নর-খাদক বাঘের কাছে এ চালাকি বহু সময়েই ধরা পড়ে যায়।

বুদ্ধির আলোকে আমাদের সংস্কারকে বহুরূপে মার্জিত করা যায়। খাঁচায় বদ্ধ পাখি ভালো উড়তে পারল না কারণ তার অভ্যাস নেই। অভ্যাস যেমন আমাদের নতুন জিনিস দেখায় তেমনি পুরনো জিনিসের ভিত্তিকেও দৃঢ় করে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ—রসের মতে, প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা ছাড়া সংস্কারের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। সংস্কার ও প্রক্ষোভ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংস্কারের প্রকাশের ইন্ধন যোগায় আমাদের মনের অনুভূতি বা প্রক্ষোভ। এটা ম্যাগড্যুগলের মত।

তিনি ১৪টি মূল প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। এই প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে জড়িত (প্রক্ষোভ) অনুভূতিগুলিকেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন।

1. Escape—পালান	1. Fear—ভয়
2. Combat—যুদ্ধের ইচ্ছা	2. Anger—ক্রোধ
3. Repulsion—ঘৃণা	3. Disgust—বিরক্তি
4. Parental—বাৎসল্য	4. Tender emotion —স্নেহপ্রীতি
5. Appeal—অনুনয়	5. Distress—দুঃখ
6. Mating—যৌনতা	6. Lust—কাম
7. Curiosity—কৌতূহল	7. Wonder—বিস্ময়
8. Submission—আত্মসমর্পণ	8. Negative self-feeling —হীনমন্যতা
9. Self assertion—আত্মপ্রতিষ্ঠা	9. Positive self-feeling—আত্মগৌরব
10. Gugarions—দল বাঁধার ইচ্ছা	10. Feeling of lonliness —একলা বোধ করা
11. Food seeking—খাদ্যান্বেষণ	11. Gusto—ক্ষুধা।
12. Acquisition—জমান	12. Feeling of ownership —নিজস্ববোধ
13. Construction—গড়া	13. Feeling of creativeness —সৃজনস্পৃহা
14. Laughter—হাসি	14. Amusement—আনন্দ

মনোবিজ্ঞানীরা সকলে ম্যাকডুগালের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা সংস্কার ও প্রক্ষোভের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সহজাত সংস্কার যখন আপন প্রকাশের পথ রুদ্ধ দেখে তখনই মনের মধ্যে প্রক্ষোভ জাগে। তাই সংস্কার ও প্রক্ষোভ এক সঙ্গে আসে না, পর পর আসে।

তাঁরা আরও বলেন যে এই ধরনের ধরা-বাঁধা ছকে মানুষের সংস্কার বা অনুভূতি চলে না। কারণ বুদ্ধির প্রভাব মানুষের ওপর প্রচুর। ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের শ্রেণী-বিভাগ করলেও করা যেতে পারে। কারণ মানুষের মস্তিষ্কের মত তাদের মস্তিষ্কের গঠন এত জটিল ও উন্নত নয়। জীবদেহের ক্রমবিবর্তনের ধারাগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগতের যেমন জটিলতা বাড়ছে মনোজগতেরও জটিলতা সেই পরিমাণেই বাড়ছে। নীচুস্তরের প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধি এই দুটি সংস্কারই প্রবল।

প্রত্যেক আবেগের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন হয়। যেমন ভয় পেলে মুখ চোখ বসে যায়, হাত পা কাঁপতে থাকে, তেমনি রাগ হলে চোখ ঠিকরে বেরতে চায়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তের চাপ বাড়ে।

শিক্ষকের কাজ—সব রকম সুশিক্ষা দান ও সুঅভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময় শৈশব। বর্তমানে শৈশবের শিক্ষার ভার বহুলাংশে এসে পড়েছে শিক্ষকদের ওপর। এখন আর শিশুদের বেশীদিন মার আঁচলে বাঁধা থাকতে হয় না। তিন বছর পড়তে না পড়তেই তারা preparatory school-এ যেতে পারে। কারণ যদিও শিশুর স্থান মায়ের কোলে, তবুও সেখানে যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান করা হয় সেটা অধিকাংশ বাড়িতেই অসম্ভব। তাই শিক্ষকের প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তিকে আমরা বর্জন করতে পারি না। ছোট শিশু যখন নতুন স্কুলে আসে তখন নতুন নতুন পরিবেশে সে বেশ বিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম তার মনে হয় যেন তার চিরপরিচিত পরিবেশ থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকদের দেখে সে ভয় পায়, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতে পারে না সব সময় একটা আড়ষ্ট ভাব তাকে ঘিরে থাকে। এর ফলে তার মনোজগতে একটা আলোড়ন হয়। তার বাড়ির ছোট-ভাই-বোনদের ওপর তার হিংসে হয়। কেননা সে স্কুলে যাচ্ছে আর তারা বাড়িতে আনন্দে বসে আছে। প্রত্যেকের এই মনোভাবের প্রকাশ সমান হয় না। কোন কোন শিশু তাই স্কুলে যেতে কেঁদে-কেটে অস্থির

হয় আবার কেউ বা অনিচ্ছায় অপরিতৃপ্ত মন নিয়ে যায়। শিক্ষকের এই বিভিন্ন ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তিনি প্রতিটি শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের স্কুল-জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়কে যেন তারা ভয় করার বদলে ভালবাসতে পারে সেটাই বড় কথা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করে দেখা দেয় বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলো। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নানা কারণে তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। শিক্ষকের নিপুণতার সঙ্গে এই কৈশোরের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। উত্তেজনা বা উদাসীনতা কোনটাই তাঁর থাকা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তারা পুরোনো পরিবেশ ছেড়ে এসে মনঃকষ্টে থাকে। এসময় তাদের সঙ্গে যদি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা না হয় তাহলে তাদের প্রভূত মানসিক ক্ষতি হয়। বাড়ির সংস্কার-পূর্ণ জীবনের সঙ্গে স্কুলের জীবনের একটা দ্বন্দ্ব তাদের মনকে নিরন্তর ক্ষুব্ধ করে। শিক্ষক যিনি হবেন এদিকে তাঁর দৃষ্টি রাখতে হবে।

আবার অনেক সময় আমরা দেখি যে শিক্ষার্থীর বিষয়-নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকে না। তার অভিভাবকরাই সে ভারটা নিজেরা তুলে নেন। এর ফলে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত বিষয় নিতে পারে না, আর সে দুঃখ তার মন থেকে কোনদিন যায় না। অপছন্দের বিষয়ে সে মন দিতে পারে না, তাই তাতে সে ভাল করতে পারে না, আবার পরবর্তী জীবনে তাই সে ব্যর্থ হয়। বাড়ির সবাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেণ্ট বলে বাবা জোর করে I. Sc-তে ভাল করা ছেলেকে পাঠালেন B. Com-এর দরজায়। ছেলের ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে, তাই শত মুখস্থ করেও হয়তো B. Com. তার পাশ করা হল না। তাই বিষয়-নির্বাচনের ভার মূলতঃ শিক্ষার্থীর হাতে থাকবে। তবে শিক্ষকের কাজ তাকে প্রবণতা অনুযায়ী চালনা করা। তাই শিক্ষক আজ আধুনিক কালের নানা রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর প্রবণতার

খোঁজ করে যদি তাকে সেই দিকে এগিয়ে নেন তবে বিষয়নির্বাচন আর তার কাছে কঠিন হয় না।

স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে বা অকৃতকার্য হয় তারা মনে মনে দমে থাকে। তাই শিক্ষকের কাজ হবে তাদের দমা ভাবটা কমানোর জন্ত উৎসাহ দেওয়া।

বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় যে চটপটে প্রিয়দর্শন শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের একটা দুর্বলতা থাকে। এর ফলে তাদের সামান্য সামান্য দোষত্রুটি তাঁদের চোখ পড়ে না। বাকী যারা থাকে তারা সেই রকম বিশেষ স্নবিধার অধিকারী না হওয়ার জন্ত মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয় ও অন্যদের ঈর্ষা করে। অনেক সময় তারা লঘু অপরাধে গুরু শাস্তি পায়। তখন তাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে খাতা-বই নষ্ট করে, স্কুল-ঘর নোংরা করে, বেঞ্চ ভেঙে। শিক্ষককে তাই সব সময় নিঃস্বার্থ হতে হবে। ভালদের তিনি ভালবাসবেন, সেই সঙ্গে খারাপদের অবহেলা করবেন না। শিক্ষকরা সব সময় চিন্তা করে শাস্তি দেবেন। কারণ শাস্তির মূল্যটা যেন তারা বুঝতে পারে। শিক্ষকরা অত্যধিক শাস্তি কখনই দেবেন না। কিশোর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ভীতু প্রকৃতির থাকে। তারা একটু বকুনি খেলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায় ও তাদের মনোজগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ছোটবেলার ইঁদুর ও আরশোলার ভয় অনেক কিশোরের মনে এমন বাসা বেঁধে থাকে যে বড় হয়েও তারা তা ভুলতে পারে না। তাদের সেই ভয় বকে বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ছাড়াতে গেলে ফল ভাল হয় না।

আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে সকলেই ভালবাসে। শিক্ষক তাই পড়াকে শিক্ষার্থীদের কাছে নীরস আনন্দহীন না ক'রে বিষয়ে বৈচিত্র্য এনে নানা রকম উপকরণের সাহায্যে, শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে বিষয়ে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। আর তাদের কাজকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করে তাদের আনন্দ দিতে পারেন। কারণ ছোটদের কাছে পুরস্কারের লোভটা কম নয়। ছোট শিশুরা ভাঙা-গড়ার

কাজ বেশী ভালবাসে। শিক্ষক তাদের সেই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেবেন। তাদের সেই খেলাকে ছেলেমানুষির চোখে দেখে তাদের অবজ্ঞা করবেন না বা নিবৃত্ত করবেন না। কারণ তাদের মনের কল্পনা এদের মধ্যে দিয়েই রূপ পাবে।

খেলাটা সব ছেলেমেয়েই অল্পবিস্তর ভালবাসে। খেলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক যেমন পড়াশুনা-বিষয়ক বহু জিনিস শেখাতে পারেন তেমনি পারেন নিয়মানুবর্তিতা, দলের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি শেখাতে। খেলার মধ্য দিয়েই ছেলেরা পরস্পরকে সাহায্য করতে, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এগুলো তাদের সংস্কার। খেলা এইসব সুস্থ বৃত্তির বিকাশের পথে সহায়ক। শিক্ষকের তাই সব সময় লক্ষ্য করতে হবে যাতে খেলাধুলা ঠিকভাবে পরিচালিত হয়। কেননা তা না হলে অখেলোয়াড়-জনোচিত মনোভাব তাদের মধ্যে প্রশ্রয় পাবে। তারা যেন প্রতিযোগীদের প্রতি অকারণ ঈর্যান্বিত না হয়, খেলার সময় প্রত্যেকেই যেন দলের এবং দল-নায়কের আনুগত্য মেনে চলে। কারণ এই সুস্থবৃত্তির বিকাশ স্কুলের খেলার পক্ষেই প্রয়োজনীয় নয়, জীবনের খেলার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয়। পড়াশুনোয় অকৃতকার্য ছাত্র হয়তো খেলায় ভাল, সেখানে তার যেন বৃথা অহংকার না আসে এবং পড়াটাকে সে যেন গৌণ মনে করার সুযোগ না পায়। কেননা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখাযায় ভাল খেলোয়াড়েরা পড়াশুনার প্রতি উদাসীন।

মানুষ মাত্রেরই কৌতূহলের শেষ নেই। শিশুর ত' কথাই নেই। তাদের দিনরাত 'এটা কি ওটা কি'র জালায় বড়দের কান ঝালাপালা। কিন্তু শিশুর কৌতূহল নিবৃত্ত করার মানেই তার মানসিক মৃত্যু। তাই তার কৌতূহলকে বাড়তে দেওয়া উচিত ও কৌতূহলের নিবৃত্তিও করা উচিত। সব ক্ষেত্রেই কৌতূহলের একটা সীমা তাঁরা নির্দেশ করবেন। কারণ সরল শিশু বুদ্ধির অগোচরে বহু প্রশ্ন করে থাকে যা তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। সেগুলোর প্রশ্রয় না দিয়ে শিক্ষক তাদের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন। কৌতূহলের প্রবৃত্তি দিয়ে শিক্ষক তাকে নতুন বিষয়ে উৎসাহী করতে পারেন।

শিশুর অনুভূতিময় জীবনকে বাদ দিয়ে শিক্ষা হয় না। ছোট শিশু স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল। তাকে শিক্ষকের স্নেহ দিয়ে জয় করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গৃহের অশান্তিতে ক্ষুব্ধ মন নিয়ে স্কুলে এসে ছাত্র যদি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার না পায় তাহলে সেটাও তার কাছে কারাগার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অশান্তিতে তার যে মন গড়ে ওঠে তা কখনই সুস্থ হতে পারে না। অনাথাশ্রমে পালিত অনেক সময় শিশুদের জীবন পরিণত বয়সে তাই বিকৃত দেখা দেয়। স্নেহ, আনন্দ ও সহানুভূতি জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এসব যারা পায় না তারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের মানসিক জীবনকে বিকৃত ও জটিল করে তোলে। তাদের ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশ হয় না বলে তারা নানাভাবে নিজেরা নিজেদের শাস্তি দেয়। অনেকে আবার বেপরোয়া হয়ে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাহসী মনে হলেও তারা দুর্বল। তাদের দুর্বলতায় হাত পড়লেই তারা অন্য মানুষ হয়ে যায়। এরা সমাজের শত্রু হিসাবেই সমাজে বাস করে। শিক্ষক একজন সমাজসেবী হিসেবে এদের এই মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে সুস্থ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু জ্ঞানদানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষার্থীর চরিত্র-গঠনেও তাঁকে সহায়তা করতে হবে। চরিত্র গঠন করতে হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আবেগ-অনুভূতিময় জীবনকে আগে সুস্থভাবে গড়ে তুলবেন। তা না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না।

একাদশ অধ্যায়

অভ্যাস

অভ্যাস ও অভ্যাসের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি—এক কথায় অভ্যাস বলতে আমরা সেই দক্ষতাটুকুকেই বুঝি যেটা আসে বারবার একই কাজ করার মধ্য থেকে। এই দক্ষতাটুকু যখন আসে তখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেই কাজ ভুলচুক না করেই করি। এটা অবশ্য সুস্থ মনের কথা। মন যখন বিচলিত থাকে তখন অভ্যস্ত কাজেও ভুল হয়। ছোটুবাবু রোজ দশটা পর্যন্ত নামতা বারে বারে পড়ে। এখন তার এমন হয়েছে যে, সে চোখ বুজেই নামতা বলতে পারে। বই বন্ধ করেই শ্লেটে লিখে যেতে পারে। একেই বলে অভ্যাস। রোজ পড়ে পড়েই তার এই দক্ষতাটা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কোন কারণে খুব বকুনি খাওয়ার পরই তাকে নামতা জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তার অনেক ভুল হল। এটা তার বকুনি খাওয়ার ফলে বিচলিত চিত্তেরই ফল। অভ্যাস এখানে ঠিকমত কাজ করতে পারল না।

অভ্যাসের সঙ্গে আমাদের সহজাত সংস্কারের একটা সম্পর্ক আছে। যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি আমাদের একটা সহজাত সংস্কার। এই অভ্যাসের সঙ্গে মনের যোগও গভীর। বাঙালীদের ভাত খাওয়া অভ্যেস। রুটি তারা খেতে পারে না। খাদ্য হিসেবে রুটি ভাতের চেয়ে ভাল। এ খেলে পেট ভরে না এমন নয়, তবুও শুধু মাত্র অভ্যেসের বশেই তারা তা খেতে পারে না।

সহজাত সংস্কার বশে আমরা বাঘ বা সাপ দেখলে ভয় পাই। কিন্তু একনিষ্ঠ অভ্যাসের ফলে সার্কাসের বাঘের খেলোয়াড় আর বেদেরা অনায়াসে তাদের নিয়ে খেলা দেখায়। এতে সহজাত সংস্কার অভ্যাস দিয়ে দূর করা হয়েছে। আমাদের সাধারণত যা ভাল লাগে আমরা তাই অভ্যাস করি আর যা ভাল

লাগে না তা সহজে চাই না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সুফলের আশায় আমরা অনেক কিছু অভ্যাস করি।

অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন ও রীতি—আমাদের সব কাজই চলছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর নির্দেশে। কোন উত্তেজক যখনই কোন খবর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে পাঠায় তখনই সেই জায়গা থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী পর্যন্ত একটা আলোড়ন জাগে। বারবার ঐ একই কাজ করলে পথের রেখা গভীর ও সচ্ছন্দ হয়। অভ্যাসের মূল সূত্র পুনরাবৃত্তি। বারবার একই কাজ করলে পরের বার কাজটি করার সময় আর ভাবনা চিন্তার দরকার থাকে না, কাজটি প্রায় আপনা থেকেই হয়। যে বিষয়েই অভ্যাস করতে হবে তা নিয়মিত করতে হবে। কোন অজুহাতে তাকে বাদ দিলে চলে না। কারণ কয়েকদিন অনিয়ম করলেই সাইন্যাপসের বাধা প্রবল হয়ে উঠবে, আর অভ্যাসের পুনরুজ্জীবন করতে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ফলে যাদের মধ্যে ধৈর্যের অভাব তারা আর পারবে না। ভোরে ওঠার অভ্যাস বেশ কিছুদিন কষ্ট করে ভোরে উঠে করতে হয়। একবার ভালমত অভ্যাস হলে আর কষ্ট হবে না। যদি কোন কারণে বেশ কিছু দিন ধরে বেলা করে উঠতে হয় তারপর ভোরে ওঠা বেশ কষ্টকর হয়। এইভাবে আমাদের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে অভ্যাসের সহায়ক করতে হবে।

আমরা সেই সব কাজই করতে ইচ্ছা করি যা আমাদের ভাল লাগে। যে কাজটা ভাল লাগে না তা আমরা করতে চাই না। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যা আপাত-মধুর না হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল। আমাদের সেই সব কাজ অভ্যাস করতেই হয়। একবার যদি ভাল ফলের স্বাদ পাওয়া যায় তা হলে সাধারণত আমাদের মন সেই অভ্যাসটি সৃষ্টি করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের যদি বলা যায় যে মন দিয়ে পড়লে লজেন্স পাবে তাহলে দেখা যাবে যে তারা লজেন্সের আশায় মন দিয়ে পড়ছে। অভ্যাসটি করার জন্য সব সময়ে ছোটদের কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত, তাদের পুরস্কার দেওয়া উচিত। তবে পুরস্কারের লোভে অভ্যাস গঠন সব

সময় ভাল ফল দেয় না। অভ্যাসের ভিত্তি সেখানে দৃঢ় হয় না। পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করে ধীরে ধীরে তার চেতনাকে জাগাতে হবে। সচেতন অনুশীলন সুঅভ্যাস গঠনের সহায়ক।

বিদেশ থেকে হয়তো একজন ছেলে তার আত্মীয়ের বাড়ি পড়তে এল। তার ভোরে উঠে পড়ার অভ্যাস নেই। কিন্তু সেই বাড়িতে যদি সকলে ভোরে উঠে পড়ে, তাহলে পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করতে পারে।

উপদেশ দিয়ে অভ্যাস গঠনটা ঠিক ভালমত হয় না। তাতে মন বিগড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। চুরি করতে নেই, চুরি করা পাপ—এই সব না বলে যাতে তার চুরি করতে না হয় বা সেই প্রবৃত্তি না জাগে সেই দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হয়। কেউ হয়তো কোন জিনিস বারেবারে ভুল করছে। তখন কর্তব্য হবে ঠিক জিনিসটা বারে বারে তার সামনে উপস্থাপন করা।

যে জিনিসটা অভ্যাস করতে হবে সুযোগ পেলেই তা অনুশীলন করতে হবে। যেমন অনর্গল ইংরাজীতে কথা বলার অভ্যাসটা ভাল করেই হবে যদি আমরা সুযোগ পেলেই ইংরাজী বলবার চেষ্টা করি।

নতুন কোন অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের মনের জোর বাড়াতে হবে। অভ্যাস যান্ত্রিক হলে সময়ই বেশী নষ্ট হবে, সেই অনুপাতে কাজ হবে না। মনের জোর নিয়ে যদি একাগ্রভাবে কোন স্থির লক্ষ্য বিষয়ে অভ্যাস করা যায় তাহলে কার্যক্ষেত্রে ভাল ফল লাভ করা যায়।

জীবনে সুঅভ্যাসের প্রয়োজন সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তবে অনেকে বলেন যে অভ্যাস মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে। কিন্তু জীবনে যান্ত্রিকতার দামটুকু খেলনা নয়। সাধারণ লোকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে বহু কাজ আমরা নিয়মিত করে অভ্যস্ত হতে পারি। তার ফলে সেই সব কাজের জন্য আমাদের আর মাথা ঘামাতে হয় না। নিয়মিত ব্যায়াম করে যদি আমরা নিজেদের দেহ সুস্থ রাখতে পারি তাহলে শরীর-সংক্রান্ত অনাবশ্যক চিন্তা আসবে না। সেই সময় অন্য কাজ করতে পারি।

অনেক বলেন যে অভ্যাস নতুন কিছু গ্রহণে বাধা দেয়। এটা সব সময় ঠিক খাটে না। আমাদের মনের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। হয়তো একজন যোগাসন করে শরীর রক্ষা করছেন। তিনি হয়তো ১০ বৎসর যাবৎ একই ব্যায়াম করে আসছেন। এমন সময় তিনি যদি কোন ফলদায়ী নতুন আসনের খবর পান তাহলে তিনি সেটা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতাটা নির্ভর করে আমাদের মনের শক্তির ওপর। সংস্কারমুক্ত সচেতন মনই সেটা সবচেয়ে ভাল পারে।

অভ্যাস আমাদের পরিশ্রম বাঁচায়। অভ্যস্ত কাজে স্নায়ুমণ্ডলীর তেমন কষ্ট হয় না। অভ্যস্ত কাজে আমাদের নিপুণতা বেশী দেখা যায়। কিন্তু নৈপুণ্যমূলক অভ্যাসটা যত্ন-প্রযুক্ত হওয়া চাই। তা না হলে নৈপুণ্য আসে না। আজীবন লিখেও বহু লোকের হাতের লেখা ভাল হয় না।

কুশলতা, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার মূলে আছে সচেতন অভ্যাস।

শিক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের স্থান—শিক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের একটা বড় মূল্য আছে। অভ্যাসে একটা যান্ত্রিকতা আছে সেটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অনেকে বলেন যে অভ্যাসের দাস হয়ে জীবন কাটানো মৃত্যুর সমান। জীবনে যদি শুধু অভ্যাসই থাকে, বিস্ময় রোমাঞ্চ এসব না আসে তাহলে জীবন ব্যর্থ। স্থিতিবাদীদের মতে, একটানা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলাই উচিত। তা না হলে সমাজ চলতে পারে না। এই দুই দলের মতের সত্যতা আছে, তবে কোন বিষয়েই চরমপন্থী হওয়া উচিত নয়। সাধারণের পক্ষে দুইএর সম্মিলনই ভাল। সকলেই যদি গতানুগতিক অভ্যাসের দাস হত তা হলে বড় বড় আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এসব কিছুই সম্ভব হত না। অভ্যাস নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। সকলেই যদি গতিবাদী হয় তাহলে সমাজ সংস্কার কিছুই বাঁচে না। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলাই দেখা দেবে। তাই নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অভ্যাস আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে তার যান্ত্রিকতাটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে। ছোট ছেলেদের প্রথম বর্ণপরিচয়টা গতানুগতিকভাবে না করিয়ে

নানা রকমের খেলবার জিনিসের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেটা বেশী ভাল হয়। এতে অভ্যাসটা ঠিকই হয়, তবে ঠিক যান্ত্রিকভাবে নয়। বারে-বারে ভুল করে তাই তাড়াতাড়ি জোর করে বকুনি দিয়ে কিছু অভ্যাস করাতে গেলে সে অভ্যাসটা ঠিকমত হয় না।

অভ্যাস মানুষের প্রবণতা জাগায়। যে গান ভালবাসে নিয়মিত গানের অভ্যাস তার গানের প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দেয়। এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের রুচি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের রুচি যে দিকে সেই দিকে যদি তাদের চালনা করতে হবে ও অভ্যাসের সুযোগ দিতে হবে। ছোটবেলায় ছবি আঁকার প্রবণতাটুকু অনভ্যাসের ফলে আর জীবনে বাড়তে পারে না।

শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল যাতে হয় তারই ব্যবস্থা করা। যাতে তারা নির্মল-চরিত্র হয়, অফুরন্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, কর্মক্ষেত্রে আগুয়ান হতে পারে তার চেষ্টাই শিক্ষক করবেন। চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষকের সব সময় দৃষ্টি থাকবে। ছাত্রজীবনে অনেকে পড়াশুনোয় অব্যাহতি দিয়ে নানারকম নেশায় মেতে থাকে। কারুর বা খেলা, সিনেমা, কারুর চা। এসব ক্ষেত্রে উপদেশ না দিয়ে তাদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে তাদের কুঅভ্যাসের পরিবর্তন করা যায়। শিক্ষক নিজে সুঅভ্যাস পালন করে ছাত্রকে তা শেখাবেন। এ সম্পর্কে পূতচরিত্র মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নির্দেশ উল্লেখযোগ্য, ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন শিক্ষকদের হাতে। তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করানো সবই অভিভাবকও শিক্ষকদের কর্তব্য।

জাতিগঠনের দায়িত্বও শিক্ষকের হাতে। তাই কঠোর নিয়ম পালন করিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচারশক্তি-হীন না করে তাদের সুঅভ্যাস গঠনে সহায়তা করে জীবনের নিত্য নতুন ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইন্দ্রিয় ও বোধ

দেহের বাইরের খবরগুলো সংগ্রহ করে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। জীবনের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজন যে কত বেশী সে সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। এদের যে কোন একটির অভাব মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে।

চক্ষু—চোখের কলা-কৌশল ভারী বিচিত্র। চোখটা যাতে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে সেজন্য কতকগুলো পেশী তাকে ধরে রেখেছে। চোখের গোলকের চারিদিকে একটা কালো ও সাদা আবরণ আছে। চোখের সঙ্গে ক্যামেরার খুব মিল। ক্যামেরায় যেমন বাইরের জিনিসের ছবি একটা পর্দার ওপর প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনি বাইরের জিনিসের ছবি চোখের লেন্সে প্রতিফলিত হলেই তবে আমরা দেখতে পাই। চোখের মধ্যের যে বড় কালো অংশটা সেটা আলো পড়লে বেড়ে যায় আর আলোর অভাবে ছোট হয়ে যায়। চোখের পেছনেই চোখের লেন্স। এই লেন্সে কোন দোষ হলে বা এর পাশের পেশীগুলোর ক্রিয়া ঠিকমত না হলেই আমাদের দৃষ্টির কাজে বাধা হয়। পেশীগুলির ত্রুটি নানারকম ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে সংশোধন করতে হয়।

চোখের লেন্সের পিছনে থাকে জল, তাবপর থাকে Retina ; এটাই ছবি প্রতিফলিত হবার পর্দা। অক্ষি-গোলক থেকে সংযোগকারী স্নায়ু ছবিকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেবে। চোখ যখনই কোন কাজ করল তখনই সেই খবরটা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। এই স্নায়ুগুলো সোজা পথে চলে না। চোখের স্নায়ু মস্তিষ্কের বাঁ দিকে ও বাঁ চোখের স্নায়ু মস্তিষ্কের ডান দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কর্ণ—কানের ফুটোর কিছু দূরেই রয়েছে কর্ণপটাহ। এখানে এসেই শব্দের তরঙ্গ প্রতিহত হয়। শব্দের তরঙ্গের স্পন্দনের বৈচিত্র্যের জন্যই আমরা নানারকম বিষয় শুনি। কর্ণপটাহের পেছনে আছে ইউস্টাসিয়ান টিউব নামে একটা নল। এই নলটাই নাক, কান গলার সঙ্গে যোগ রেখেছে। কানের শেষ অংশটা খুব জটিল। একটা ফাঁপা হাড়ের নল এখানে আছে। তার পেছন দিকটা পেঁচানো। এর ভেতরে স্নায়ুতন্ত্র আছে। এরাই আমাদের শোনার সহায়ক। এখান থেকে স্নায়ুশিরা মস্তিষ্কে গেছে।

নাসিকা—নাকের ভেতরে কতকগুলি স্নায়ুকোষ আছে। এই স্নায়ুকোষগুলিই আমাদের গন্ধের অনুভূতি জাগায়। এইখান থেকেই মস্তিষ্কের বোধ কেন্দ্রে যায়। সুন্দর ফুলের গন্ধ পেলে আমরা ফুলের দিকে এগিয়ে যাই। ফুলের গন্ধের খবর মস্তিষ্কে পৌছনোমাত্রই মস্তিষ্ক তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট অঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। নাকের গন্ধ-বোধের ক্ষমতা বেশ তীব্র। অতি মৃদু গন্ধও মনঃসংযোগ করলে আমাদের নাকের কাছে ধরা পড়ে। কয়েকটি জীবের এ ক্ষমতা আরও বেশী থাকে। তারা গন্ধ দিয়ে শুধু মাত্র খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন করে তা নয়, আপদ বিপদের সূচনাও ধরতে পারে। কুকুর মানুষ শুঁকে মানুষ চেনে। মাটি শুঁকে উট মরুভূমিতে ঝড়ের ও জলের আভাস পায়।

জিহ্বা—জিভের গঠনের মধ্যে এমন কতকগুলি কোষ আছে যেগুলি আমাদের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা রাখে ও মস্তিষ্কে সেই খবর কতকগুলি স্নায়ুশিরার-মারফত পৌছে দেয়। খাবার জিনিস মুখের ভেতর গেলেই আমাদের জিভ থেকে একরকম লালা বেরোয়। খাদ্যবস্তু এর সঙ্গে মিশে আমাদের স্নায়ুকোষগুলিতে অনুভূতি জাগায়। জিভের সব জায়গায় সমান স্বাদ পাওয়া যায় না। জিভের সামনের দিকে আমরা মিষ্টি আস্বাদ পাই, মাঝখানে পাই নোনতা ও ঝাল স্বাদ, শেষের দিকে তেতো আস্বাদ আর দুপাশে পাই টক আস্বাদ। জিভ শুধু আমাদের খাদ্যের স্বাদ বিচারে সাহায্য করে না, আমাদের কথা বলার পেছনেও জিভের হাত অনেকখানি। আমাদের উচ্চারণের বিভিন্নতা জিভের সঞ্চালনের মাধ্যমেই হয়।

ত্বক—আমরা চোখ দিয়ে দেখি ও কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে গন্ধ পাই, জিভ দিয়ে স্বাদ নিই, চামড়া দিয়ে পাই ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি, স্পর্শ ও ব্যথার অনুভূতি। আমাদের দেহের চামড়ার সব জায়গার অনুভূতি সমান নয়। এক-এক জায়গায় এক-একটা অনুভূতি বেশী বা কম হয়। মুখে একটা চিমটি কাটলে যত লাগে হাতে ততটা লাগে না। এই অনুভূতি গ্রহণের যন্ত্র হচ্ছে আমাদের চামড়ার তলার Corpuscle গুলি। এরাই আমাদের চামড়ার বিভিন্ন অনুভূতির গ্রাহক।

আমাদের দেহের ইন্দ্রিয়গুলির প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে বাইরের খবর সংগ্রহ করে মস্তিষ্ককে জানানো। ইন্দ্রিয় আমাদের বোধ জাগায়। যারা কাণে শোনে না সুরের বৈচিত্র্য তাদের মনে দোলা দিতে পারে না। যারা চোখে দেখে না পৃথিবীর কোন সৌন্দর্যই তাদের কোন অনুভূতি জাগাতে পারে না। অজ্ঞান অবস্থায় আমাদের দেহের কোন বোধের শক্তি থাকে না। তাই ব্যথা বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই আমরা অনুভব করি না। ফুলের সুন্দর গন্ধ আমরা বাগানে বসে পেলাম, এটা হল বোধ (sensation) কিন্তু সেটা কোন্ ফুলের গন্ধ যুঁই কি বেলের—এটা হল (perception) প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে আছে বোধ। বোধ আমাদের মনে শুধুমাত্র এই অনুভূতিটুকুই জাগায়। কেন্দ্রে উপস্থাপিত বস্তুটি কি আকারের কি গুণের অধিকারী, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। পুকুরের জল ও সমুদ্রের জলের আস্বাদ শুধুমাত্র এই বোধই জাগায় যে একটা মিষ্টি, আরেকটা নোনা। Perception দুটো জলের পার্থক্য ধরে কোনটা কোন জল সেটার বিচারে সাহায্য করে।

আমাদের এক-একটা ইন্দ্রিয় এক-একটা বোধ জাগায়। কিন্তু সব অনুভূতিই সমান হয় না। কোনটা তীব্র, কোনটা ক্ষীণ। এটা নির্ভর করে উত্তেজকের উপর। যে উত্তেজক যত তীব্র তার অনুভূতিও তত তীব্র। যে উত্তেজক যত ক্ষীণ তার অনুভূতিও তত ক্ষীণ। আমাদের এক-একটা ইন্দ্রিয় এক-এক ধরনের অনুভূতি জাগায়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বোধে

তফাৎ থাকে। গানের স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ সবই আমরা কাণ দিয়ে শুনতে পাই ও চড়া ও খাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। গায়ে কম্বল দিয়ে শুয়ে আছি। হাতটা বাইরে আছে। আমাদের দেহের স্পর্শানুভূতি ঠিক ধরতে পারে দেহের কতখানি কম্বলে ঢাকা, কতখানি নয়। এর জন্য চোখের দরকার হয় না। স্থান বিশেষে অনুভূতিও বিভিন্ন হয়। পায়ের তলায় ও হাতে একই সময় যদি সুড়সুড়ি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে পায়ের তলায় বেশী তাড়াতাড়ি সুড়সুড়ির বোধ জাগে। কতকগুলি জিনিসের বোধ আমাদের কাছে ভাল লাগে, আবার কতকগুলি জিনিসের অনুভূতি আমাদের কাছে অপ্রিয়। টক, ঝাল, মিষ্টি জিনিসের স্বাদ আমাদের প্রিয়, কিন্তু তেতো জিনিসের স্বাদ আমাদের অপ্রিয়। বোধের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও একটা জ্ঞান আমাদের মনে জাগে। বেল ফুলের গন্ধ পেলাম। গন্ধটার স্থায়িত্ব কতক্ষণ সে সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ধারণা হল। মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে তফাৎ আছে। অনুভূতির সাহায্য নিয়ে মানুষ বিমূর্ত বিষয়ের চিন্তা করতে পারে, কিন্তু ইতর প্রাণী তা পারে না।

মনোবিজ্ঞানী ওয়েবার ও ফেকনার দুজনেই উত্তেজকের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে বোধের হ্রাস-বৃদ্ধির গবেষণা করেছেন। একটা গোটা জমিতে এক চামচ সার ছড়িয়ে দিলে আমরা জমির ওপর সারের কোন প্রতিক্রিয়াই দেখতে পাব না। কিন্তু যদি এক চামচ দু চামচ করে ক্রমাগত সার বাড়িয়ে যাই তখন একটা সময়ে আমরা একটা প্রতিক্রিয়া পাব। এইভাবে আমরা যতই সার বাড়াব জমির উর্বরতা ততই বেড়ে যাবে। কিন্তু বাড়ার হারটা প্রথমে যেমন ছিল শেষে আর তেমন নেই। একটা সময় আসবে যখন সারের পরিমাণ বাড়ানো সত্ত্বেও উর্বরতা বাড়ল না। বোধের বেলাতেও ঠিক তেমনি হয়। অতি মৃদু উত্তেজক আমাদের কোনো বোধ জাগায় না। ঘরের মধ্যের বহু ছোটখাট শব্দ ও জিনিস প্রায়ই আমাদের চোখ ও কানকে এড়িয়ে যায়। তাই উত্তেজককে বোধ জাগানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমায় আসতে হবে। খুব ছোট জিনিস আমাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু সেটা যদি চক্‌চকে হয় তাহলে চোখে পড়ে। এইভাবে উত্তেজক বাড়লে বোধ বাড়ে। কিন্তু একটা সময় আসে যেখানে উত্তেজক যতই বাড়ুক না কেন বোধ আর বাড়ে না।

ওয়েবার এই বৃদ্ধিটা কি অনুপাতে হয় সেই নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখলেন যে উত্তেজক যে পরিমাণে বাড়ে বোধ সে পরিমাণে বাড়ে না। বোধের একটা শেষ সীমা আছে। একটা অতি মৃদু আলো জেলে একটা ছবি দেখতে দেওয়া হল। আলোর মাত্রা একটু একটু করে বাড়াতে থাকলে ছবিটা একটু একটু করে স্পষ্ট হল। শেষে এমন একটা সময় এল যখন আলো যত জোর হল দেখার স্পষ্টতা সেই পরিমাণে আর বাড়ল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিস্মৃতির অন্তরালে

আমাদের মনের চেতন অংশ ছাড়াও একটা অবচেতন অংশ আছে। এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করেন প্রথম ফ্রয়েড। তিনি বলেন যে চেতন মনটাই আমাদের মনের সবটা নয়। আমাদের মনের সব চিন্তা ন্যায়-নীতির অনুশাসন মেনে নেয় না। তাই সব রকমের চিন্তাই আমাদের প্রিয় হয় না। আবার এমন অনেক চিন্তা মনে আসে যেগুলো প্রিয় হলেও ন্যায় নীতির প্রশ্ন সেগুলোকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেয় না। এই ধরনের যে সমস্ত চিন্তাকে আমরা জাগতে দিই না তারা তাদের আশ্রয় খোঁজে অবচেতন মনের অন্ধকারে। আমাদের বহু নিরুদ্ধ কামনা, ভুল, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, ঘৃণা সব এইখানে এসে জমা হয়। মাঝে মাঝে এরা অবচেতনের অন্ধকার ছাড়িয়ে চেতন মানসে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়েই তাদের আবার জোর করে অবচেতন মনে পাঠিয়ে দিই। প্রকাশের সুযোগ এরা খুব কম সময়ই পায়। অবচেতন

মানসে এরা নানা জটের সৃষ্টি করে। এর ফলেই নানা রকম বিপর্যয় দেখা দেয়। ফ্রয়েড এই সব রোগের চিকিৎসা করলেন তাঁর বিখ্যাত মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি দিয়ে। আমাদের অনুভূতিগুলো আপন বহিঃপ্রকাশের পথ না পেয়ে যে জটের সৃষ্টি করে, সেই নিরুদ্ধ অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের মূল উৎপাটন করতে হয়। এই ধরনের রোগের চিকিৎসা সম্মোহনের মাধ্যমে চলত। ফ্রয়েড সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের মনের কথা বের করে আনতেন। সহানুভূতির স্পর্শে রোগীরা তাদের জীবনের সব কথা খুলে বলে ফেলত। ফ্রয়েড তার থেকেই রোগের মূল বার করে তাদের অনুভূতির জীবনকে সুস্থ করে তুলতেন। একে বলা হয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি বা psychoanalysis.

অনুভূতির স্বাভাবিক প্রকাশে বাধা বহু রকম জটের সৃষ্টি করে। সাধারণত এই জটগুলোর সৃষ্টি হয় ছোট বেলায়। পরিণত বয়েসেও এরই ফলে তাদের আচরণের নানারকম বৈষম্য দেখা যায়। তোতলামী, বাঁহাতে কাজ করা ইত্যাদি নানা ধরনের মুদ্রাদোষের পিছনেও এই ধরনেরই কারণ থাকে। এই সব বিকৃতিগুলো জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে রোগী নিজেই তার কারণ নির্ণয় করতে পারে না।

আবেগ অনুভূতিকে জোর করে ভুললেও বিপদ, না ভুললেও বিপদ। জোর করে ভুললে নানা বিকারের জন্ম, আর না ভুললেও মানুষের পাগল হয়ে যেতে হয়। কেননা আমাদের শোক দুঃখ সব সময়েই যদি আমাদের মনের মধ্যে জেগে বসে থাকে তাহলে আমরা অস্থির হয়ে উঠতাম। তাই ভোলবার একটা যুক্তি আছে। তবে সেই ভোলাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিতে হবে। জোর করে তাকে ভুললে চলবে না। সেইজন্য অন্য কাজে মনোনিবেশ করে যে বিষয়টা ভোলা দরকার তা থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। গভীর শোকে ধর্মের দিকে মন নিয়ে যাই ভোলার জন্য। দুঃখকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করবার মত মানসিক ক্ষমতা যাদের হয় বা থাকে তারাই এসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্যা

শিক্ষার কথা বলিবার আগে শিশুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রত্যেক শিশুর চরিত্রে বা আচরণের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কীভাবে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয় তাও লক্ষ্যণীয়। প্রথমে দেখি, যে জন্ম নিল তার প্রাণে সঞ্চারিত হল এক নবচেতনা। একে একে ইন্দ্রিয়-গুলোর কাজ শুরু হল ও একটা নির্দিষ্ট ধারায় সেগুলো কাজ করতে লাগল। তারপর বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিশুর অন্তর্জগতে চলতে থাকল বিবর্তন, হল বুদ্ধির বিকাশ। এই সামগ্রিক জীবনের পরিচয়ই তার ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

ব্যক্তিত্বের বিবরণ

ফুলের প্রকৃত পরিচয় তার সৌরভে, তেমন মানুষের পরিচয় তার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে। ব্যক্তিত্বকে খণ্ডছিন্ন করে দেখা না গেলেও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উপাদান নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি কয়েকটি শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এই ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে ওঠে। যেমন অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, ক্ষিপ্রতা, স্বাধীনগতি, খাপ খাইয়ে চলার শক্তি, চেষ্টার তীব্রতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংযম, আবেগের সামঞ্জস্য ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বের উপাদান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্যের দিকে জোর দিয়েছেন, আবার দৈহিক গড়নের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের বিভাগ করেছেন। মানসিক গঠনের দিক থেকে য়্যুঙ্গ (iyung) ইণ্ট্রোভার্ট, একস্ট্রোভার্ট ও এ্যাম্বিভার্ট এই তিন ভাগে ব্যক্তিত্বকে ভাগ করেছেন।

ইণ্ট্রোভার্ট হল তারা, যাদের স্বভাব হল আত্মকেন্দ্রিক—কারও সঙ্গে এরা সহজে মেশে না। আর একস্ট্রোভার্ট হল এর ঠিক উল্টো—আর এ্যাম্বিভার্ট হল দুয়ের সংমিশ্রণ। এ-ছাড়া ব্যক্তিত্বের নানা শ্রেণী বিভাগ হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় আঠারো হাজার ব্যক্তিত্বের উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। উডওয়ার্থের মতে ১২টি প্রধান গুণকে ও তাদের বিপরীত দোষগুলিকে ব্যক্তিত্বের উপাদান বলে লক্ষ্য করা হয়েছে।

যেমন—

মৌলিক গুণ	বিপরীত
১। আয়াস	অনমনীয়তা
২। বুদ্ধিমত্তা	বুদ্ধিহীনতা
৩। স্থৈর্য একাগ্রতা	অস্থিরতা
৪। নেতৃত্বাভিমান	আত্মপ্রত্যয়ের অভাব
৫। মিশুকেভাব	গুজগুজেভাব
৬। সহানুভূতি	নির্মমতা
৭। মার্জিতরুচি	স্থূলরুচি
৮। দায়িত্বজ্ঞান	দায়িত্বহীনতা
৯। দুঃসাহস	হিসাবীভাব
১০। উদ্যোগ ও তৎপরতা	অলসতা
১১। আত্মাভিমান	নিস্তেজভাব
১২। বিশ্বাসপরায়ণতা	সংশয়চিত্ততা

কিন্তু ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপ। তাই এই সামগ্রিক প্রকাশকে বুঝতে হলে উপাদান-বিশ্লেষণ করলেই হবে না। এর জন্যে অবচেতন মনেরও সন্ধান নিতে হবে। রোজানফ্ (Rosaneff) মানসিক বিকারের প্রবণতার দিক থেকে মানুষকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— যেমন নর্মাল, হিস্টেরয়ড্, সাইক্লয়েড, সিজয়েড ইত্যাদি। যাঁরা অবচেতন মনের সন্ধান নিয়ে ব্যক্তিত্বকে বুঝতে চান তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড, লিউয়িন্, মারে রসাকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিত্বের বিবরণ :—কোনো এক জনের ব্যক্তিত্বকে বোঝাতে হলে হয় বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে হয় নতুবা কয়েকটি বিশেষ গুণ দিয়ে বিশোধিত

করতে হয়। তাই টাইপ হিসেবে মানুষকে ভাগ করা একটা জনপ্রিয় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন কোনো লোককে আমরা বলি দাম্ভিক—তার অর্থ লোকটার অহঙ্কার আমাদের চোখে পড়ে। একটা মোটামুটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই Typeএ ভাগ করার চেষ্টা। ফলে এই বিবরণ কতটা বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিপূর্ণ তা বলা কঠিন।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ :—ব্যক্তিত্ব ক্রমশই বিকশিত হয়ে ওঠে। একে একে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তিত্বের একটি দিক জন্মগত, অন্যটি পরিবেশগত। ফলে যে অংশ পরিবেশগত তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব অনেক।

অনেকে চরিত্রকে ব্যক্তিত্ব থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। আবার অনেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের নৈতিক দিকটিকে চরিত্র বলে আখ্যা দেন।

ব্যক্তিত্বের বিচার—ব্যক্তিত্ব নিরূপণের নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া গেল। যেমন—

(১) কাগজ-পেন্সিল দিয়ে ব্যক্তির অনুরাগ, দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ গুণ পরীক্ষা করা।

(২) ছবি প্রভৃতি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্বের বিচার।

(৩) মৌখিক আলোচনা দ্বারা (interview) ব্যক্তিত্ব নিরূপণ।

(৪) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ (case shidy).

(৫) মনঃসমীক্ষণ (Paychoanalysis) ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্ব কী?—ব্যক্তিত্বকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না, জীবনের সামগ্রিক রূপই তার পরিচায়ক ; তবুও তাকে যে কয়েকটা উপাদানে ভাগ করা যায় একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন :—

ক। বুদ্ধিবৃত্তি।

খ। আবেগ-উচ্ছ্বাস।

গ। দৈহিক শক্তি ইত্যাদি।

বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে দেখা যায়, প্রত্যেক শিশুরই কিছু-না-কিছু বুদ্ধির সম্পদ আছে, তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। শুধু তাই নয়, প্রাণশক্তির দিক থেকেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে। এখন কীভাবে এই পার্থক্যের হিসাব নেওয়া যায়, কীভাবে বুদ্ধি অনুযায়ী এদের বিশেষ বিশেষ কাজে লাগানো যায় সেদিকে দৃষ্টি পড়েছে। চেষ্টাও হচ্ছে যাতে করে শ্রেণী-পাঠন ও শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিশুর ব্যক্তিত্ব নিরূপণের সমস্যা

শিশুকে শিক্ষা দেবার আগেই তার বুদ্ধি-বৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। কারণ কোন শিশুর মধ্যে কতটা সম্ভাবনা আছে তা বিচার করতে হলে জানতে হবে তার রুচি অর্থাৎ কোন বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী—ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়, কার্যে ক্ষিপ্রতা, মেজাজ, সততা ও এমনি নানা রকম গুণাবলী। এই ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা সার্থক করে তুলতে হলে চাই কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ধরা যাক, শিশুর কোনো কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা ও আত্মপ্রত্যয় জানতে হবে, আর এই দুইটি গুণ জানতে চাওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, দেখা যায়, এই দুটি গুণের উপর শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবনের কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ে ওঠে কেবল তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করেই নয়, তার আগ্রহ ও আসক্তি এগুলোর উপরও নির্ভর করে তার সাফল্য। যে, যে-বিষয়ে আগ্রহশীল সে-বিষয়েই স্বভাবতঃ তার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য আগ্রহ ও আসক্তি নিরূপণের চেষ্টা করাও বোধ হয় শিক্ষকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু কীভাবে এই আসক্তি নিরূপণ করা যায় এই কথাই আজ শিক্ষাবিদ্‌দের বিব্রত করে তুলেছে। অনেক রকম পদ্ধতি আছে, যেমন অনেকগুলো কাজের তালিকা দিয়ে কোন কাজ করতে ভালো লাগে তা জেনে নেওয়ার চেষ্টা। অবশ্য এই কাজগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, এক-একটি কাজ এক-একটি দিকের নির্দেশ দেবে; যেমন—অভিনয়

করা, এখন যে অভিনয় করা পছন্দ করবে নিশ্চয় বুঝতে হবে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি শিল্পী-স্থলভ মন। বাগান করা যার ভালো লাগে বুঝতে হবে তার কৃষির দিকে প্রবণতা বা ঝোঁক আছে। তাহলেই প্রশ্ন উঠে যে, কটা মূলধারায় মানুষের রুচিকে ভাগ করা যায়। এবিষয়ে অনেকের অনেক রকম মত আছে, তবে ভারতীয় পরিবেশে কাজের স্থবিধার জন্য মানুষের রুচিকে নিম্নের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

ক। কলা বা চারুকলা।
খ। বিজ্ঞান।
গ। ব্যবসা-বাণিজ্য।
ঘ। যন্ত্রপাতি।
ঙ। কৃষি।
চ। জ্ঞান আহরণ।

অনেক রকম পদ্ধতি* থাকলেও সব কয়টি প্রয়োগ করার স্থবিধা বা স্থযোগ হয় না। তবে কয়েকটি পদ্ধতি তার মধ্যে বেছে নেওয়া দরকার। যে, যে-বিষয়ে অনুরাগী সে সে-বিষয়ে যে বেশ কিছু খবর রাখবে এটা খুবই স্বাভাবিক। যেমন যার অনুরাগ আছে কৃষির উপর—তার পক্ষে কোন গাছে কী সার দেওয়া উচিত, গাছের গোড়া কোন সময় খুঁড়ে দেওয়া উচিত, কোন গাছ অন্ধকার জায়গায় ভালো হয়, এই রকম সব খবর রাখা সম্ভব। এমনি যার অনুরাগ আছে সাহিত্য বিষয়ে—সে নিশ্চয় খবর রাখবে, কোন দেশে কে বড় কবি, কে কোন কাব্য বা উপন্যাস লিখে "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন ইত্যাদি। এই ধরনের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ধরা পড়তে পারে শিক্ষার্থীর খবর জানবার প্রবৃত্তির ওপর বা খবরের পরিমাণের ওপর।

আর একটি পদ্ধতি আছে যেখানে অনেকগুলো কাজের তালিকা দিয়ে শিশুকে নির্বাচন করতে বলা হয়। সে-সব কাজের মধ্যে কোন কাজ সে পছন্দ করে এটা জানবার জন্য তাকে অনেক রকম প্রশ্ন অনেক সময় করা হয়। যেমন,—স্কুল থেকে ফিরে এসে তুমি সাধারণতঃ কোন কাজ করে আনন্দ পাও?

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অনেকে বলেন যে, প্রশ্ন দিয়ে শিশুদের কাছ থেকে তাদের অনুরাগ জানবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ অনেক সময় প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করবার মতো বুদ্ধি শিশুদের থাকে না, বা বিশ্লেষণ করতে পারলেও সততার অভাবে তারা ঠিক উত্তর দেয় না। এইজন্যে প্রশ্ন না দিয়ে সত্যিকারের পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে বা অনুরূপ কোনো পরীক্ষা করে তাদের অনুরাগ নির্বাচনের চেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন।

শিশুপ্রকৃতি কেবলই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আরও কিছুর উপর। আবেগ, প্রাণধর্ম, অনুভব, মেজাজ ও ভাবদৃষ্টির উপরও শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। যে-শিশু আবেগ-ধর্মী তাকে সব সময়ই কামনা, উচ্ছ্বাস ও উল্লাস আন্দোলিত করে। তবে কি তাকে অস্বাভাবিক বলা হবে? মোটেই নয়। প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই আবেগের এলোমেলো স্রোতের জন্যে কিছু-না-কিছু সাময়িক ঝড়ঝাপটা দেখা দেয়। এর থেকে একেবারে নিস্তার পাবার উপায় নেই, তবে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে এদের দিকে তাকাতে হবে আর চেষ্টা করতে হবে যাতে সম্ভবমত এইসব কামনা পূর্ণ করা যায়। আবেগ-ধর্মী শিশুদের মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

ক। সহজেই যারা বিরক্ত হয়।
খ। যারা কারণে অকারণে আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে।
গ। ক্রোধ যাদের সহজে অভিভূত করে।
ঘ। একগুঁয়ে শিশু।
ঙ। বৈক্লব্যগ্রস্ত শিশু।

সহজেই যারা বিরক্ত হয়

লক্ষণ—এই শ্রেণীর শিশু খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কোনো কিছু মুখস্থ করতে দেরি হয় ও কোনো কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরা বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমোতে পারে না ও মাথার ওপর সব সময় যেন কিছুর বোঝা অনুভব করে। এরা ট্রামে-বাসে চাপলে অসুস্থ অনুভব করে।

কারণ—এইসব মানসিক অসুস্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—হয় শরীরের ওপর অত্যধিক পীড়ন, একটানা একঘেয়ে কাজ করা, কিংবা অন্য কোনো অনেকদিনস্থায়ী ব্যাধি এইরূপ মানসিক অসুস্থতাকে ডেকে আনে।

করণীয়—ক্লান্তির দুটি প্রকার আছে—একটি দৈহিক, একটি মানসিক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানসিক ক্লান্তি দৈহিক ক্লান্তির চেয়ে প্রবল হয়, ফলে কার্যক্ষমতার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষককে সবসময় অবসাদের কারণগুলো মনে রাখতে হবে এবং নানা প্রকার কাজ দিয়ে শিশুদের প্রাণে আনন্দ দিতে হবে।

শিশুর যে-বিষয়ে বেশী কৌতূহল সে বিষয়েই তাকে কাজ করতে দিতে হবে। প্রচুর খেলাধূলার ব্যবস্থা, মুক্ত বাতাসে মাঝে মাঝে চলাফেরা করতে দেওয়া ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু হালকা ধরনের আনন্দ পরিবেশন এই সমস্যাকে দূর করে।

যারা কারণে অকারণে আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে

যে-সব শিশু এই পর্যায়ে পড়ে, অর্থাৎ যাদের মন সব সময় শঙ্কিত তাদের চিনতে বেশী দেরি হয় না, কারণ কয়েকটি লক্ষণ গোড়া থেকেই এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষণ—রাত্রের মাঝখানে এরা ভয়ে জড়সড় হয়ে অনেক সময় বিছানায় জেগে শুয়ে থাকে।

এই দলের অনেক শিশুর মধ্যেই তোতলামি দেখা দেয়, আর সে তোতলামির কারণ ভয়।

ঘুমের মাঝখানে অনেক সময় এরা দাঁতে দাঁতে শব্দ করে।

ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলে।

ভয়ের স্বপ্ন দেখে।

যারা উদ্বেগে ভুগতে থাকে তাদের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়, যেমন,—একদল আছে যারা নিজেদের প্রাধান্য দেখাতে না পেরে সব

সময়ই আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। সব সময়ই তাদের চিন্তা—হয়তো তাকে কেউ অবহেলা করছে কিংবা আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে তাদের যোগ্য সমাদর হচ্ছে না।

কারণ—যাদের উদ্বেগ শুধু অপরাধকে কেন্দ্র করে—অর্থাৎ যাদের মনে সব সময়ই অপরাধের চেতনা—মন তাদের গোড়া থেকেই কুঞ্চিত হয়ে পড়ে অভিভাবকদের দোষে, কারণ অভিভাবকদের সব সময় বাধা-নিষেধ তাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে খর্ব করে দেয়।

এই অপরাধ-চেতনা ছাড়াও আর এক রকম উদ্বেগ এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সে হচ্ছে সমাজের কাছ থেকে পাওয়া অবহেলার জন্যে। হয় তার মনে হয়, তাকে বুঝি দেখতে খারাপ, না হয়, এমনি আরও হীনতাবোধ।

এই ধরনের শিশু খুব বেশী দেখা না গেলেও এদের সংখ্যা ক্রমশঃই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগুন ও রক্তপাতের ভয় এবং এমনি আরও অনেক ভয় এদের জড়সড় করে তোলে তাই এদের নিয়ে প্রবল সমস্যা।

করণীয়—এই ধরনের শিশুদের নিয়ে শিক্ষককে খুব সতর্ক হতে হবে, কারণ অল্প একটু উপেক্ষা বা অসতর্কতা অনেক সময় অনেক অনর্থ ডেকে আনতে পারে।

এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত নয় যাতে শিশুর মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

যাতে আবেগ বা উত্তেজনা দেখা যায় এমনি কোনো ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিত।

শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে ভয়ের কিছুই নেই ; অন্য সব শিশুর মতো তাকেও বুক ফুলিয়ে চলতে হবে, তারও জগতে বাঁচবার অধিকার আছে। মোট কথা একটা দরদী প্রাণের স্পর্শই হচ্ছে শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

ক্রোধ যাদের সহজে অভিভুত করে

লক্ষণ—ক্রোধই যাদের মনকে সব সময় অভিভূত করে, যাদের মেজাজ সব সময়ই রুক্ষ, তাদের বুঝতে হলে তার কারণ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন।

এই ক্রোধ নানা রূপে দেখা দেয়, যেমন—একটি শিশু যা পায় তাকে কামড়াতে চেষ্টা করে, ছিঁড়ে ফেলে একাকার করার চেষ্টা করে। হাতের জিনিস চুরমার করে ভেঙে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত হয়। লোকজন দেখলে তারা কীভাবে তাদের অসুবিধা করবে বা আঘাত করবে এই জন্যে সচেষ্ট হয়। ধ্বংসের প্রতি একটা আকর্ষণ যেন এদের মনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে ওঠে।

আর একদল আছে যারা ধ্বংস না করলেও মনে মনে জিনিস ভাঙবার চুরবার জন্য সব সময় একটা প্রবল বাসনা পোষণ করে।

কারণ—অনেক সময় দেখা যায় যে, এই সব শিশুরা প্রথম জীবনে অত্যন্ত বেশী আদর পেয়েছে এবং তার ফলে তাদের আবদারে মনোভাব এসে গেছে।

এদের পরিবারে হয়তো সব সময় অশান্তি গোলমাল ঝগড়াঝাটি লেগে থাকে ও তার ফলে ছেলেবেলা থেকেই মন এদের বিগড়ে যায়।

করণীয়—কারণ বিশ্লেষণ করার পরই যে-সুযোগ থেকে শিশু বঞ্চিত হয়েছে সম্ভবমত তাকে সেই সুযোগ বা স্নেহ দিতে পারলে ভালো হয়। শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার জন্যে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে যা সুন্দর তাকে উপভোগ করতে গেলে চাই সংযম। এইভাবে শিশুর মনে দাগ কাটতে পারলে, ভালোর প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে পারলে ক্রমশঃই শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন কমে যাবে।

একগুঁয়ে শিশু

এই ধরনের শিশুর প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী, কারণ এদের মধ্যে অনেক সময় বিরাট সম্ভাবনা দেখা যায় এবং যত্ন ও পরিচালনার অভাবে সে-সম্ভাবনা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষণ—এই সব শিশু সাধারণতঃ দেরি করে স্কুলে আসে, আঙুলের নখ কামড়াতে থাকে, অন্যের বিরক্তি আনবার চেষ্টা করে এবং সাধারণতঃ বেশী

কথা বলে। প্রাধান্য বিস্তারের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা এদের মধ্যে প্রবল রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তাই যেখানেই বিধি-নিষেধ তার বিরুদ্ধেই এরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কারণ—মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এইরূপ আচরণের প্রধান কারণ। একদিকে বাধা-নিষেধ আর একদিকে মনের স্বাভাবিক গতি, এই দুয়ের মাঝে যখন সংঘাত বাধে তখনি এদের আচরণের বিকৃতি দেখা দেয়, আর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে শিশু হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এর ফলেই এদের আচরণ সমাজ-বিদ্রোহী হয়ে দেখা দেয়।

করণীয়—যাদের মধ্যে এই রকম একগুঁয়েমি দেখা যায় তাদের সংশোধন করতে গেলে চাই শিক্ষকের কৌশলী মন। যেমন—যে-শিশু খুব বেশী নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করতে চায়, তাকে কোনো কিছু দল বা সভা গড়বার সুযোগ দিতে হবে। যার মধ্যে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি খুব বেশী, তাকে মিথ্যা ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঝগড়া করবার অবকাশ দিতে হবে। এমনি ভাবে তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোর মোড় ঘুরিয়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকার দেখা যায়।

বৈক্লব্যগ্রস্ত শিশু

যে-সব শিশুদের মধ্যে দৈহিক কিছু বৈক্লব্য দেখা যায় তাদের নিয়েও সমস্যা কম নয়। এই সব দৈহিক বৈক্লব্য নানারূপে প্রকাশ পায় :—

লক্ষণ—চলাফেরার মধ্যে জড়তা।

কথা বলবার শক্তি হারানো।

অন্ধ বা বধির হয়ে যাওয়া।

স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তি।

কারণ—দৈহিক বিকৃতির মূলে অনেক সময় মনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাই যারা কেবল দেহতত্ত্বের জ্ঞান নিয়ে এই সব রোগ সারাতে চান তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় আছে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব অনেক সময়

পক্ষাঘাতের আংশিক কারণ হয়ে দাঁড়ায় একথা আজ অনেকেই বুঝতে শুরু করেছেন।

আকস্মিক কোনো মানসিক আঘাত বা আবেগের দিক থেকে কোনো বিশৃঙ্খলা অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনেক সময় এই বিকৃতিকে ডেকে আনে।

অপ্রত্যাশিত কোনো আলোকের বন্যা, বিপুল কোনো শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করতে যদি মনের প্রস্তুতি না থাকে তবে দৈহিক কারণ ছাড়াও এই বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়।

বিস্মৃতির প্রধান কারণ মানুষের মনের নির্দিষ্ট ধারকতা ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। আমরা যা ভুলতে চাই তাই ভুলি, এমনি একটা কথা আজ মনোবিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ যা আমাদের কাছে অপ্রীতিকর, যে-অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে তিক্ত, তা মনের গহনে ঠাঁই পেলেও, চেতনালোকে তার কোনো ঠাঁই হয় না। এই জন্যই শিশুদের মধ্যে যখন চরম বিস্মৃতি দেখা দেয়, তখন সেই স্মৃতিলোপের কারণগুলো একে একে বিশ্লেষণ করতে হবে।

অনেক সময় বড় রোগের পর, মানসিক আঘাতের পর বা বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বের পর স্মৃতির বিলুপ্তি দেখা যায়। হয়তো মানুষের মন মুক্তি খুঁজতে চায় বাস্তবের সংঘাত থেকে, তাই স্মৃতির রাজ্যে ভাঙাগড়া শুরু হয়ে যায় এবং এমন এক সময় আসে, যখন ঘটনার স্রোত মনের বালুচরে কোনো রেখাপাতও করে না।

করণীয়—মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড বলেছেন যে, অবচেতন মনের অন্তরালে এমন অনেক সংঘাত দেখা দেয় যার প্রতিক্রিয়া ভয়ানক রূপ নেয়। এই সব প্রতিক্রিয়ার ফলেই নাকি নানা বিকৃতি ও বৈক্লব্য সূচিত হয়। এই সব সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই মনঃসমীক্ষণ অর্থাৎ মনের মাঝখানে ডুব দিয়ে রোগীর সমস্যার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা। এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তুলতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন রোগীর বিশ্বাসভাজন হওয়া। সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সহানুভূতি দিয়ে শাসন করতে হবে ও এক সময় দেখা যাবে যখন

রোগী তার সব কিছুই খুলে বলবে কোনো কিছু গোপন না রেখে সেই ফেলে-আসা দিনগুলির ইতিবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে চিকিৎসার মূলসূত্রটি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেক রোগী, ডাক্তার বা শিক্ষকের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যায়। এই অবস্থায় বুঝতে হবে রোগীর মনের আঘাতের কথা, অভিমানের কথা, আর তাকে সাহায্য করতে হবে সুস্থ সবল মন ফিরে পেতে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্যা

যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি মানসিক সুস্থতা বা মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত অপরিহার্য। সচেতন অনুভূতিকে নিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগৎ গড়ে ওঠে না। কারণ, অবচেতন মনের প্রভাব আমাদের মানসলোকে বিশেষ প্রবল। রুদ্ধ কামনা ও অনুভূতি চেতন-মানসে মুক্তি না পেলে মানসিক বিকার দেখা যেতে পারে। তাই এই বিস্মৃতির অন্ধকারে অনেক সময় আত্মগোপন করে থাকে, আমাদের মনের অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা ও কামনা। মনের গহনে তারা ডাক দিতে থাকে, শাসন ও অনুশাসনের বেড়াজাল ভেদ করবার সংকল্প নিয়ে।

শেষে এই রকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যখন প্রবল রূপ নেয়, তখন তাদের সুসংহত করা সম্ভব হয় না। তখনি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়। নানা উত্তেজনার ফলে দেখা দেয় "হিস্টিরিয়া" প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি। ফ্রয়েডের মতে যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি সব রকম মানসিক বিকারের মূল কারণ। তাই মানুষের সামাজিক বুদ্ধি যদি আদিম প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তবে নানা বিকার ও জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এই জট খুলতে না পারলে রোগ সারানো মুশকিল হয়। সম্মোহন-পদ্ধতিকে ফ্রয়েড স্বীকার করলেও তিনি বুঝেছিলেন যে, এর মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। তাই সে পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে-পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, তা হল রোগীর মনের সব কিছু খবর নিয়ে তাকে আরাম দেবার চেষ্টা। যা তুচ্ছ, যা অশ্লীল,

তাকেও বলতে বলা চলে রোগীর মনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালে।

নানারূপ সমস্যা আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ফলে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি। কিন্তু এদের মূলে একটি কামভাব লক্ষ্য করা যায়। শিশু অনেক সময় আপনাকেই বেশী ভালোবাসে ও আপনার দেহকে নিয়েই নিজের কাম তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের প্রেমেই সে মাতোয়ারা। তাই খেলাধূলা সব রকম তার নিজেকে নিয়েই। এই স্তরে আত্মরতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়।

একে একে যৌবনের উদ্গম হবার সঙ্গে সঙ্গে সমলিঙ্গ কাম দেখা দেয়। এই সময় তাই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সে নিজেরই লিঙ্গের প্রতি বিশেষ সজাগ। ফ্রয়েডের মতে শৈশব থেকেই মানুষের কাম জাগতে থাকে, এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটলেই যত অনর্থের সূচনা। আজ যে-সব বিকার দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হল, এই শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বা সহজাত প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছনীয় নির্দিষ্ট মানসিক পথে প্রবাহিত করবার অক্ষমতা। ফলে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে নানারূপ বিকৃতি দেখা দেয়। কেবল এই সব মানসিক বিকারই নয়, বুদ্ধিহীনতা বা বৈক্লব্য আজ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মূলে আছে মানসিক দুর্বলতা ও চিত্তবিক্ষোভ।

অনেক সময় আবেগ ও উদ্দাম উচ্ছ্বাস শিক্ষার্থীর মনকে বিকৃত করে তোলে। কোনো অঙ্গবিকার, যেমন তোতলামি, বামহাতে কাজ করবার প্রবণতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ মুক্তির আস্বাদ পায় তখন, যখন সে রূঢ় বাস্তবের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে কল্পনার আশ্রয় নেয়। এরই ফলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার জন্ম। এই বাস্তব থেকে পালিয়ে অবচেতন মন আত্মরক্ষার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসী। কখনও কোনো কিছু খারাপ জেনেও সে তাকে স্বীকার না করে পারে না। কখনও আবার কাজটির সমর্থনে যুক্তি খুঁজে বেড়ায় ও নানারূপ কৌশল

অবলম্বন করে। কখনও বা সে আত্মসমর্পন করে, আবার কখনও নিজের দোষ পরের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ইংরাজীতে একে বলে projection, rationalisation ও defence mechanism.

শিক্ষকের কাজঃ—শিশুদের সমস্যা-সমাধানের ব্যাপারে সমাধান খুঁজতে হলে শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ নেওয়া, তাকে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে জয় করে নিয়ে তার মনের খবর জেনে সমস্যা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা। তার রুদ্ধ কামনার যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়া ও সুশিক্ষার সাহায্যে শিশুর স্বাভাবিক মনকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব শিক্ষকের ওপর।

পিছিয়ে-পড়া শিশু—অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছেই পিছিয়ে-পড়া শিশু এক সমস্যা। কেবল লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও অনেককে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ বা সমাজে, কেউ বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, কেউ বা কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে।

এই পিছিয়ে পড়া তা হলে নানা রকমের হতে পারে—আর এর কারণও একটি নয়। বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ ও ফলে তার কারণও বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কেউ অধ্যবসায়ী, কেউ নয়, কেউ সাহসী, কেউ ভীরু, কেউ উৎসাহী, কেউ বা উদাসীন। শিশুদের মধ্যে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি সকলেই পরিবেশ অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। কয়েকজন বা চঞ্চল ও স্থৈর্যহীন। এই পিছিয়ে-পড়া শিশুর দল অনুপাতে সংখ্যায় কিছু কম হলেও এদের নিয়ে সমস্যা বড় প্রবল।

তবে সাধারণতঃ যে-সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে নীচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়ঃ—

(ক) মনোনিবেশ করার শক্তির দৈন্য।

(খ) কোনো বিশেষ সমাবেশে ঠিকমতো সাড়া দিতে বিলম্ব।

(গ) কোনো কিছু বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধ শক্তি।

(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছাবার অক্ষমতা।

(ঙ) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবার ক্ষমতার অভাব।

(চ) নূতন পরিবেশে পরিচিতকে হারিয়ে ফেলবার প্রকৃতি।

(ছ) কোনো কিছু শিখতে অসম্ভব দেরি করা ও তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া ইত্যাদি।

এ ছাড়াও শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলেও বোঝা যায়, শিশু কোন বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যদি দেখা যায় যে কোনো শিশু সব বিষয়েই পিছিয়ে পড়েছে, তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ ছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার সার্থকতা আছে। পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কী কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নানা কারণে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে—

(১) বুদ্ধিহীনতা।

(২) বিষয়ানুরাগের অভাব।

(৩) কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাব—যথা, অধ্যবসায়-হীনতা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব।

(৪) বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি।

(৫) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈক্লব্য।

তাই কোনো সমাধান খুঁজবার আগে মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে ও যথাসম্ভব তার প্রতিকার করতে হবে।

যদি দেখা যায় যে, কোনো জন্মগত বুদ্ধিহীনতা বা মানসিক ও দৈহিক বৈক্লব্য এর জন্যে দায়ী, তবে এর সমাধান সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সম্ভবপর নয়। বিশেষ কোনো বিদ্যালয়ে যেখানে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে সেখানে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। তবে সুখের বিষয় পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্যা খুবই কম।

তবে পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। এর জন্যে পিতা-মাতা অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তাঁরা প্রথম ভর্তির সময়ে তাঁদের সন্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করবার জন্যে উপরোধ ও অনুরোধ করেন। ফলে ক্রমশ ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও ক্রমশ শিশু পেছিয়ে পড়ে। তাই অভিভাবকদের কর্তব্য, শিশুর যোগ্যতা বুঝে অনুরূপ শ্রেণীতে ভর্তি করা। তারপর বৎসরান্তে উঁচু শ্রেণীতে উঠবার সময়ও অনেক অযোগ্য শিশুকে অভিভাবকদের অনুরোধে উঠিয়ে দিতে হয়। এতে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে প্রবল হয়ে উঠছে তার অন্যতম কারণ প্রতিকূল পরিবেশ। চারিদিকে প্রলোভন চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষার্থীর পাঠানুরাগ ক্রমশই কমে আসে। সমাজে উজ্জ্বল আদর্শের অভাব এই বিক্ষেপের অন্যতম কারণ।

কিভাবে এর সমাধান হতে পারে?

অভিভাবক ও পিতামাতার কর্তব্য—বাড়িতে শিশু যাতে পিতামাতার কাছ থেকে আদর-যত্ন পায়, তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আবেগ, উচ্ছ্বাস, কৌতুক, কৌতূহলকে মর্যাদা না দিলে অনেক সময় তার মানসিক বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুকে যদি আত্মপ্রকাশের পথে বাধা দেওয়া হয় ও তার কৌতূহলী মনকে দমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ভাবীজীবনে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা দিতে পারে বা অন্য কোন বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়া-পাওয়া ও আগ্রহ-আকাক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। শিশু কোন্ কাজ করতে ভাল-বাসে, কোন্দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন কাজে সে লেগে থাকতে পারে কিনা—এসব দিকে লক্ষ্য রেখে সেই অনুযায়ী উপদেশ নির্দেশ দেবারও

প্রয়োজন। শিশুর সামনে সব সময়ে একটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে হবে এবং তার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয়ত, শিশুকে ছোট বলে অসম্মান করলে চলবে না। তার ব্যক্তিত্বের যোগ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের কাজ হল তাকে কাজে উৎসাহ দেওয়া, নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া। আর শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, তার মূল কারণ হল অভিভাবকদের উপেক্ষা।

শিশু কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হল পিতামাতা অভিভাবকদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য। তাই সেই অভাব যে-কোনো ভাবেই পূরণ করা দরকার। যদি অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাৎ যদি মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকে, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব কখনও খর্ব হতে পারে না। তাই বাড়িতে শিশু যদি প্রসন্ন মনে অনুকূল পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে পড়তে পায়, তবে তার পাঠের প্রতি অনুরাগ বেড়ে উঠবে; পাঠের বিষয়বস্তুকে গল্প, খেলা ও শিশুর রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহায্যে সরস করে তুলবার চেষ্টা করা তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য

(ক) কোনো শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভরতি করা ও শ্রেণীতে উঠবার সময় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রধান শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

(খ) যারা তা সত্ত্বেও পেছিয়ে পড়েছে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা ও কারণ নির্ধারণ করা। অবশ্য এর জন্যে অভিক্ষার প্রয়োজন।

(গ) যে যে-বিষয়ে পেছিয়ে আছে সে-বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং বিষয়-ভেদে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেকের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া।

এই সব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। এই সব শ্রেণীতে দলগত চেষ্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকেন্দ্রিক-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পঠনকেও বৈচিত্র্যময় ও আনন্দপূর্ণ করে তুলতে হবে।

শিক্ষকের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখা আর একটি বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গতিবিধি, স্থবিধা অস্থবিধা ও উন্নতির সম্পর্কে পাক্ষিক আলোচনা এই সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা করে।

এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের সঠিক খবর পেতে হলে অভিক্ষার প্রয়োজন। তাছাড়া কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের কোন অংশে দুর্বল তা জানতে হলেও এই উদ্দেশ্যে প্রণীত অভিক্ষার (Diagnostic Tests) প্রয়োজন। যেমন কোনো শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে দুর্বল হয়, তবে তার দুর্বলতা কী কী কারণে হতে পারে তা এই অভিক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায়। কারও হয়ত বর্ণাশুদ্ধি বেশী হয় বলেই ইংরাজীতে দুর্বলতা কারও বা বাক্যবিন্যাসে অক্ষমতার জন্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগে না।

পরিশিষ্ট অংশে অভিক্ষা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় থেকে পলায়ন

গৃহে, বিদ্যালয়ে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যখন শিশু তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ না পায় তখনই তার চিত্তবিকৃতি দেখা দেয়। সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও সে হয়ে ওঠে অসামাজিক বা অস্বাভাবিক। এই চিত্তবিকৃতি বা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিই শিশুকে বিদ্যালয় থেকে পলায়নের অনুপ্রেরণা যোগায়।

বিদ্যালয় থেকে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত কারণগুলিই প্রধানতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির জন্য দায়ী ঃ—

(১) পরিবেশ—পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়, গৃহ ও আঞ্চলিক প্রভাব। অস্বাভাবিক পরিবেশে শিশু স্বভাবতই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং কতগুলি নীতিবিরুদ্ধ অভ্যাস ক্রমশ তাকে আকর্ষণ করে।

(২) মানসিক সংঘাত—বিভিন্নমুখী বাসনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বাসনা প্রাধান্য লাভ করে এবং তাহা চরিতার্থ না হওয়ায় শিশুর চিন্তাধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

(৩) অসংহত ব্যক্তিত্ব—শিশু তার নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ না পেয়ে ক্রমশই মনের সন্তুষ্টি ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। এ থেকেই নানারকম দুর্মতি তার মনে বাসা বাঁধে এবং সেগুলির বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দিতে সচেষ্ট হয়।

(৪) বয়ঃসন্ধিজনিত আকাশ-কুসুম কল্পনা—বয়ঃসন্ধিক্ষণই শিশুর জীবনের এক ভয়ঙ্কর সময় ; এই সময়ে তার মনে বহুবিধ অস্বাভাবিক, অবান্তর ও নিষেধাত্মক চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে। সে যেন নিজেকে ঠিক ভাবে কোথায়ও খাপ খাওয়াতে পারে না এবং অনেক সময় খেয়ালবশে বা অন্য কোনো কারণে অন্যায় কাজ করে থাকে।

(৫) নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা—শিশু অনেক সময় নিজেকে অপরের সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে এবং এ থেকে বিদ্যালয় থেকে পলায়ন এবং অপরাপর হীনপ্রবৃত্তি তার মনে জাগে।

(৬) বাড়ি বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাজে ভীতি—কারণে অকারণে শিশুর মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয়—তা হলেও এরূপ কয়েকটি দুরভিসন্ধির আশ্রয় নিতে পারে।

(৭) বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আকর্ষণের অভাব—বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর যদি প্রবল আকর্ষণ না থাকে তা হলে স্বভাবতই তার মনে হবে কী ভাবে বা কখন সে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে।

(৮) বাহিরের আকর্ষণ—সিনেমা, খেলাধূলা ইত্যাদি বাহিরের অধিকতর প্রবল আকর্ষণও অনেক সময় শিশুকে এরূপ কার্যে প্ররোচিত করে।

(৯) সময়-সূচীর ত্রুটি—একঘেয়ে আনন্দহীন সময়-সূচীর প্রভাবও শিশুকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে—যার ফলে বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত কিছুই তার কাছে বিসদৃশ ও প্রাণহীন মনে হয়।

সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১। বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নতি সাধন।

(ক) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

(খ) শিশুর প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাকে তার জীবনপথে উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দান করতে হবে।

(গ) বিদ্যালয়ে সমগোষ্ঠী গঠন করে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুকে প্রচুর আনন্দ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সুযোগ দান করতে হবে।

২। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা শিশুর উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়াস পেতে হবে।

৩। বিদ্যালয়-জীবনেই নীতিশিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে। প্রার্থনা সভা, মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

৪। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে। বিদ্যালয়েই সমাজের গঠনপ্রণালী কার্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫। শিশুর জীবনে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মিথ্যা কথা বলা

চিত্তবিকৃতির আর একটি বহিঃপ্রকাশ "মিথ্যা কথা বলা"। জেনে বা না জেনে সত্যকে এড়িয়ে চলা বা ঢেকে রাখার নাম মিথ্যা কথা বলা। সাধারণত দুই প্রকারের মিথ্যাবলা দেখা যায়—(ক) সাময়িক ভাবে মিথ্যা বলা, (খ) অভ্যাসবশে মিথ্যা বলা।

সাময়িকভাবে মিথ্যা বলা—যখন কারণে বা অকারণে মিথ্যা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তখন আমাদের হাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ কিছু থাকে না।

শিশুর মিথ্যা কথা বলার বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল—

(১) শিশু সাময়িক শাস্তি সমস্যার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য চেষ্টা করে।

(২) পারিবারিক সমস্যা শিশুর জীবনে জড়িত হয়ে পড়ে এবং বিকৃত পরিবেশ থেকে কোনোরূপ সুশিক্ষাই সে লাভ করতে পারে না। ফলে তার চিন্তাধারা উল্টোপথেই ধাবিত হয়।

(৩) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ তার মনঃপূত নয় বলেই তার মনে ধিক্কার আসে এবং সে বিকৃতরুচির আশ্রয় গ্রহণ করে।

(৪) মনের তীব্র বাসনা চরিতার্থ করতে না পেরেও শিশুর মনে অস্বাভাবিকতা আসে এবং এই থেকেই নানারূপ কদর্য অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

(৫) অনেক সময় ভালো-মন্দ বিচার-শক্তির অভাবেও শিশু মিথ্যা কথা বলে।

(৬) কোনো কোনো শিশু কৌতুক সৃষ্টি করেই আনন্দ বা বাহবা পাবার প্রয়াস পায় ও এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়।

(৭) নিজের দুর্বলতা অপরের নিকট লুকিয়ে রাখতে গিয়েও দেখা যায় শিশু মিথ্যা কথা বলে।

(৮) লজ্জা ও ভীতিও শিশুকে ঐরূপ প্ররোচনা দেয়।

এর সমাধানের নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে—

১। (ক) এর সমাধানকল্পে শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। শিশুর প্রতি সহানুভূতিমূলক ব্যবহার শিশুকে অনেকটা সৎপথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

(খ) শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে শিশুর প্রতি উপযুক্ত যত্ন নেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজে শিশুকে অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ দিতে হবে। শিশু যেন বুঝতে পারে যে সেও একজন দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া শিশুকে বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত রেখে দিলে তার কার্যধারা ও চিন্তাধারাও পরিবর্তন সম্ভবপর।

বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল আচরণ—শৃঙ্খলাবোধ বলতে আমরা দুই প্রকারের শৃঙ্খলা বুঝি—(১) বাহ্যিক (২) আত্মিক (স্বতঃস্ফূর্ত)। বর্তমানে এই আত্মিক শৃঙ্খলাবোধের উপরই বেশী রকম জোর দেওয়া হয়ে থাকে কারণ বাহ্যিক শৃঙ্খলা শিশুর উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়—এবং এর ফলে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে, বাধা ও ব্যর্থতা ক্রমশ তার মনে এনে দেয় একগুয়েমি, এ থেকেই সে হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল।

শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নানা কারণে :—

(১) সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব—কদর্য পরিবেশে শিশুর রুচিরও অবনতি ঘটতে বেশী সময় লাগে না। দিনের পর দিন সে একে একে স্বাভাবিকতা থেকে দূরে চলে যায় এবং মন পূর্ণ হয়ে যায় কদর্য আকাঙ্ক্ষায়।

(২) বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতি—পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে জটিলতা ও সমস্যা, বিশ্ব তথা মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে। এই সব জটিলতা ও সমস্যার মধ্য থেকেই শিশুর অবনতি ঘটে।

(৩) গৃহ—সামাজিক পরিবেশ শিশুর মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিবেশ বর্তমানে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়।

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর বিদ্যালয়-পরিবেশ এই বিশৃঙ্খলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। শিশুর চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও অপ্রীতিকর হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং সে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

(৫) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেই আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। সমাজে ধর্মানুষ্ঠানের ক্রম-অপসরণের ফলে নৈতিক শিক্ষা শিশুর কাছে অনেকাংশেই অজ্ঞাত থেকে যায়।

(৬) বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন থেকে শিশু তিলে তিলে বিশৃঙ্খলতার অভ্যাস গ্রহণ করে এবং বিদ্যালয় জীবনেও সেটির প্রকাশ করে।

(৭) গুরুভার পাঠ্যসূচী—বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যসূচী শিশুর দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৮) ছাত্রসংখ্যার আধিক্যবশত প্রত্যেক শিশুর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অবহেলিত শিশু অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(৯) বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা যায়—কেননা শিশু পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করতে চায়—শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে তার নজর বেশী থাকে না।

(১০) শিক্ষাপদ্ধতি অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ থাকে—তখন শিশু পাঠে না পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক, তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অসাফল্য এর জন্য দায়ী করা যায়। শিশু পাঠে আগ্রহ দেখায় না বা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে কারণ সে জানে শিক্ষালাভ করেও তার হয়ত বেকার হয়ে থাকতে হবে।

বিশৃঙ্খলতা দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে—

(১) গৃহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। সুস্থ পরিবেশে শিশু দেহে ও মনে স্বভাবতই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং কদভ্যাস বর্জন করে।

(২) বিদ্যালয় জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় করে তুলতে হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিশুর গতিপথ সরল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে—তবেই শিশু বিদ্যালয়কে নিজের বলে সহজে গ্রহণ করতে পারবে এবং বিদ্যালয়ে নিজেকে সহজেই সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।

বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা, উৎসব, অভিনয়, তর্কসভা, আলোচনাসভা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

(৩) শিক্ষা পদ্ধতিতে একঘেয়েমি দূর করতে হবে; পাঠকে সরল ও সুন্দর করে তুলে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

(৪) প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে—তবেই প্রত্যেক শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়া সম্ভবপর হবে এবং সে অবহেলিত হবে না।

(৫) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে—নচেৎ এ দুরূহ কাজ দুরূহ-ই থেকে যাবে।

(৬) শিশুর প্রতি সহানুভূতি ও আস্থা প্রদর্শন করতে হবে।

(৭) বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব যদি শিশুর উপরে দেওয়া যায় তবে দায়িত্ববোধই তাকে ক্রমশ সুশৃঙ্খল করে তুলবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বুদ্ধি ও বুদ্ধির স্বরূপ

বুদ্ধি কী, এই প্রশ্নটি আপাতত অর্থহীন বলে মনে হয়। বুদ্ধি ও ধী সমার্থক। কেউ কাউকে নির্বোধ বলে গালি দিলে সে অপমান বোধ করে। আমরা বুদ্ধির গর্ব করি বটে কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কী তা জানি না, এবং নিজে কতটুকু বুদ্ধিমান তারও সঠিক উত্তর দিতে পারি না। এরূপ ঘটে কেন? কারণ বুদ্ধি বা ধী পরিমাপের নির্ভুল সূচকের অভাবেই এরূপ ঘটে থাকে। আমরা বলি, ঐ ব্যক্তি খুব চালাক-চতুর, চটপটে; বুদ্ধিমান ও ধীসম্পন্ন; ঐ ব্যক্তি মাঝামাঝি রকমের বুদ্ধিমান, চালাক বা চতুর; আর ঐ ব্যক্তি একেবারে বোকা, হাবা, বুদ্ধিহীন। এভাবে সাধারণ, অসাধারণ

বিশেষণ দিয়ে আমরা ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি সম্বন্ধে 'মতামত' প্রকাশ করে থাকি। কথায়, কাজে, ব্যবহারে, চলন-চালনে, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার নিপুণতা বা ক্ষিপ্রতায় বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে থাকে। এই বাহ্যিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই বুদ্ধির বিচার বা পরিমাপের একমাত্র সহায়ক। কিন্তু খাঁটি, অমিশ্রিত, মৌলিক বুদ্ধি কী এটাই হল প্রশ্ন। তাই বুদ্ধির পরিমাপ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ চলছে।

বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা নিয়ে মনোবিজ্ঞানবিদদের মধ্যে অনেক মতভেদ চলে আসছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ একমত হতে পারেন নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বুদ্ধির সম্পর্কে Stern বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে বুদ্ধি মানুষের একটি সাধারণ কর্মক্ষমতা যা দিয়ে মানুষ তার চিন্তাধারাকে নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তিনি আরও বলেছেন যে বুদ্ধি হল প্রধান চাবিকাঠি যাকে দিয়ে সকল রকমের জটিল বিষয়গুলিকে মীমাংসা করা যেতে পারে। Sternএর এই মতবাদ ধীশক্তির সাধারণ নীতিবাদ বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। একজন মানুষের ধীশক্তি বা বুদ্ধি তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজ করতে সক্ষম করে তোলে।

Patterson আচরণশীলদের অনুরূপ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধিকে উত্তেজনাগুলিকে একীভূত করার শক্তি বলে মনে করেছেন। ফরাসী দেশীয় মনীষী Binet মানুষের মৌলিক বুদ্ধির পরিমাপের প্রয়াসী হন এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা শুরু করেন। তাঁর উদ্ভাবিত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা-পদ্ধতি Terman কর্তৃক পরিমার্জিত ও বিশোধিত হয়ে ট্যারম্যান-বুদ্ধি পরিমাপ-প্রণালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাঁর পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বুদ্ধি বা ধীশক্তি জটিল বিষয়ের চিন্তা করবার শক্তিমাত্র। Wechsler বুদ্ধিকে কর্মকুশলতা বলে বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধি হল এমন একটি ক্ষমতা যার প্রভাবে মানুষ তার পরিবেশের মধ্য থেকে শিক্ষা পেয়ে এবং নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে। বুদ্ধি একটি ক্ষমতা বা শক্তি যার প্রভাবে মানুষ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে; Patterson

অথবা Termanএর মতে বুদ্ধি জটিল কিন্তু এর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। Thorndike সাধারণ ক্ষেত্রে ধীশক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে বুদ্ধি একটি নির্দিষ্ট শক্তি এবং এর একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, তাঁর মত অনুসারে একজন নিপুণ ব্যক্তির, একজন সুদক্ষ-যন্ত্রীর এবং একজন সচতুর শিল্পীর ধীশক্তি বা বুদ্ধির তুলনা করা সম্ভব নয় কারণ তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের মধ্যে প্রকাশ করেন। Spearman সাধারণ একটি বিষয়কে গ্রহণ করে তার মধ্যপথ বের করবার চেষ্টা করেছেন, তিনি বলেছেন যে বুদ্ধি সমস্ত রকমের জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশেষ নৈপুণ্যকে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করে তাঁদের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রকৃতিগত এক প্রকারের কর্মক্ষমতাকে কতক সংযুক্ত করে এবং কতক বিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা বুদ্ধির উপাদানগুলি কতকগুলি দলে বিশ্লেষণ করেছেন। একে Perry, Vernon এবং Burtএর Hierarchical Theory বলা হয়।

প্রথমটি গতিময়গুণ, যেমন, কর্মে সক্ষমতা। এই কর্মক্ষমতা জটিল সমস্যার এমন জিনিস যা কোন ঘাটনীক আকারে দেখা যায় না, এটি চিন্তাধারার মধ্যে মীমাংসা করে অথবা বাধাকে অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়ে থাকে।

এটি হল জন্মগত গুণ বা ক্ষমতা; পরিবেশ এর বিকাশের পথে সহায়তা করে।

যদিও বুদ্ধি আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে, কিন্তু জ্ঞান আছে আর বুদ্ধি এক নয়, একজনের প্রচুর জ্ঞান আছে কিন্তু তার বুদ্ধি থাকতে হবে এমন নাও হতে পারে। জটিলতার মধ্যে অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিজেকে মানিয়ে নিতে বা একটা পথ খুঁজে নিতে জ্ঞান সাহায্য করবে।

স্মৃতিশক্তি অথবা যান্ত্রিক নৈপুণ্য এই গুণগুলির মত বুদ্ধি বিপথগামী হয় না। কাজের দ্বারা স্মৃতি ও যান্ত্রিক নৈপুণ্যের উন্নতি হয়।

সর্বশেষে যদিও বুদ্ধি মানুষের ব্যক্তিত্বের দান স্বরূপ, তথাপি আমরা যাকে ব্যক্তিত্ব বলি এবং যাকে আমরা বুদ্ধি বলি এদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। যেমন, প্রথম দৃষ্টিতে কোন লোকের ব্যক্তিত্ব যদিও আমাদের চোখে প্রধান হয়ে দেখা দেয় কিন্তু যতই আমরা তার সঙ্গে মেলামেশা করি এবং ঘনিষ্ট হই ততই সে আমাদের দৃষ্টি কম আকর্ষণ করতে থাকে অর্থাৎ তাকে আমরা বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ বলে আর গ্রহণ করতে পারি না। ক্রমে সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণা নষ্ট হয়ে যায়।

এখন কথা হল ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করা যায় মানুষের গতিতে, অনুভূতিতে, আবেগে, ব্যবহারে ও যত্নশীলতায়, কিন্তু বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় কেবলমাত্র মানুষের কর্মের মাধ্যমে।

বুদ্ধির আবাসভূমি নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ চলেছে। গত শতাব্দীর মনো-বিজ্ঞানবিদগণ মস্তিষ্ককে বুদ্ধির বাসভূমি বলেছেন। তাই তাঁরা মস্তিষ্কের পরিমাপের উপর নির্ভর করে ধীশক্তি বা বুদ্ধির পরিমাপ করেছেন। এই সব মনোবিজ্ঞানবিদদের মধ্যে আছেন Anatole France, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তিনি ছোট বা ক্ষুদ্রাকৃতি মস্তিষ্কের খ্যাতি বা জয়গান করেছেন, কিন্তু অধুনা এই মতবাদ অচল। এখনও মনোবিজ্ঞানবিদগণ বুদ্ধির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার দ্রুততার কি সম্পর্ক আছে তা আবিষ্কারে কৃতকার্য হতে পারেন নি।

যেমন, মাথার গড়ন দেখে যেমন বুদ্ধির বিচার চলে না সেই রকম অনেক সময় দেখা যায় পারদর্শিতা দিয়ে বুদ্ধির বিচার হয় না। কারণ হাতের লেখায় বানানে অনেক বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা (sense acuity) মাপা যায় প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্মতার পরীক্ষা দিয়েও বুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্য মাপ পাওয়া যায় না।

যেমন, একজন দক্ষ যন্ত্রীর সাধারণত প্রতিক্রিয়ার সময় স্বল্প। এমনও দেখা যায় যে একজন চতুর চিত্রকর অথবা কবি এবং কখনও কখনও লেখকের প্রতিক্রিয়ার সময় স্বল্প অর্থাৎ বোতাম টেপার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রতিক্রিয়া

হয়ে যায়। কোনো বুদ্ধির পরিমাপ করে দেখা গেছে যে প্রতিক্রিয়ার সময় যতই বাড়ান এবং দ্রুত হয় বুদ্ধির মধ্যে ততই অবনতি ঘটে। অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া ততই কমে আসে।

মোট কথা হল যে সাধারণ বুদ্ধির একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যে শক্তি নূতন সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে এবং ক্রমে সে নূতন অবস্থায় আমাদের মানিয়ে নিতে পারে।

এই কর্মক্ষমতার আরও চারটি প্রধান ভাগ বর্তমান আছে –

(১) কথোপকথন।

(২) অঙ্কগণনা।

(৩) কর্মক্ষমতা।

যদি আমরা বুদ্ধিকে এই দিক থেকে বিচার করি তবে আমাদের এর ক্রিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার যেমন Thorndike করেছেন। তিনি বুদ্ধিকে কয়েকটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন,

(১) লঘু কর্মক্ষম শক্তি

(২) সামাজিক কর্মক্ষমতা

সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের কাজ করে যেতে সাহায্য করে এবং এই ক্ষমতার দ্বারা আমরা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে পারি। লাজুক ও অন্তরমুখী ব্যক্তিগণ এই পর্যায়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে পারে না। যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই আবার পরে আর তেমনভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কারণ সে আমাদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরিচিত হয়ে গেছে।

বুদ্ধি পরিমাপ—বিশেষ একদল মনোবিজ্ঞানীদের মতে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা অর্জিত গুণের চেয়ে বেশী নির্ভর করে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যেখানে কম সেখানে উন্নত ধরনের প্রয়োগবিধিও বিশেষ কার্যকরী হয় না। সেইজন্যে প্রথমে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতার মাপ

নিয়ে তবে শিক্ষার সীমা নির্ধারণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতানুযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করতে পারা যাবে ফলে শিক্ষার সময় ও খরচ দুইয়েরই সাশ্রয় হবে। বহু মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবহারিক দিকের প্রয়োগে যত্নবান হন। এঁদের অগ্রণী হলেন Binet. ১৯০৫ সালে তিনি তাঁর পরীক্ষা (test) প্রয়োগ করেন। মানসিক ক্ষমতার অসাম্যের জন্য একই শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে কারও পড়া সহজ মনে হয় কারও বা শক্ত মনে হয়। এই অসাম্য দূর করবার জন্যই বিনের এই প্রচেষ্টা। তিনি কতকগুলো প্রশ্ন ঠিক করে রাখেন। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বইএর প্রয়োজন হয় না। একদল ছাত্রকে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর করলেন। উত্তরের নির্ভুলতা অনুসারে তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেন। এতে তিনি সাফল্য লাভ করেন। এইবার তিনি নানা বয়স অনুযায়ী নানা রকম প্রশ্ন তৈরী করে ছাত্রদের মানসিক বয়স বার করবার চেষ্টা করেন। মানসিক বয়স নির্ধারণের জন্য তিনি একটা মান তৈরীর চেষ্টা করলেন যেটা এক বয়সের বেশীর ভাগ ছেলের বুদ্ধির মাপ। এই মানকে অবলম্বন করে মানসিক বয়স অনুযায়ী ছাত্রদের ভাগ করা সহজ হয়। Binetর এই পদ্ধতি প্রথমে কেউ স্বীকার করেন নি। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে Terman Binetর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশেষ ফললাভ করেন। Terman এর পর আরও একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এর সাহায্যে অসমবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা করা যায়। একে বলা হয় I.Q. I.Q. নির্ণয় করা হয় মানসিক বয়েসকে সাধারণ বয়েস দিয়ে ভাগ দিয়ে তারপর ১০০ দিয়ে গুণ করে। যারা সাধারণ বুদ্ধির তাদের I.Q. হয় একশর কাছাকাছি। যারা সাধারণের চেয়ে উন্নতবুদ্ধি তাদের I.Q. হয় ১০০র বেশী আর যারা সাধারণের চেয়ে হীনবুদ্ধি তাদের I. Q নীচে থাকে। বিনের এই পদ্ধতি কেবলমাত্র স্বাক্ষরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই আজকাল নিরক্ষরদের নানারকম কার্যিক (performence test) পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে। Wechsler দু-রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। স্বাক্ষরদের জন্য মৌখিক আর নিরক্ষরদের জন্য কার্যিক।

এই সমস্ত পরীক্ষাগুলোতে এক একজনকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হয় ফলে সময় ও খরচ বেশী পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য Group test বা দলগত পরীক্ষার উদ্ভব হয়। এর ফলে একই সময়ে অনেকের বুদ্ধি মাপ নেওয়া যায়। এর পর শিক্ষিতদের জন্য army alpha test আর অশিক্ষিতদের জন্য army beta test-এর প্রচলন হয়। রুচি ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা পরিমাপের জন্য British Psychological Laboratory ও Chiagoর culture free test আছে।

বুদ্ধির সংজ্ঞা এক একজন বৈজ্ঞানিক এক এক রকম দিয়েছেন। Stern-এর মতে বুদ্ধি হচ্ছে একটা সাধারণ ক্ষমতা। যে ব্যক্তি বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান বলে প্রতিপন্ন হয় সে সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান। থর্নডাইক এর উল্টোটাই বলেন। তিনি বলেন যে একই ব্যক্তি একটি ক্ষেত্রে উন্নতবুদ্ধি ওয়া সত্ত্বেও অন্য আর একটি বিষয়ে হীনবুদ্ধি হতে পারে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক অভিক্ষা ও নির্দেশ

ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য পড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে কিভাবে ধরা যায়—এই হল প্রশ্ন। ব্যক্তিত্বকে খণ্ডছিন্ন করে দেখা না গেলেও তার কয়েকটি উপাদান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। একে একে দৃষ্টি ফিরল বুদ্ধির তারতম্যের দিকে। ফলে বুদ্ধি নিয়ে অনেক গবেষণা চলল। ফ্রান্সের বিনে (Binet) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর শক্তিকেই বুদ্ধি বলে মনে করেন। তাঁর মতে এটি একটি জন্মগত সম্পদ। মনের রাজা এই বুদ্ধি—কারণ মনই অন্যান্য চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি সকলেরই আছে, কারও বেশী কারও কম।

তাই বুদ্ধির এই তারতম্যকে পরিমাপ করার জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বিনে সাহেব নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লক্ষ্য করলেন যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বাড়তে থাকে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তখন তিনি সাইমন (Simon) সাহেবের সহযোগিতায় প্রশ্নমূলক পরীক্ষার উদ্ভাবন করলেন। বয়সের অনুপাতে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করা হল ও বয়স অনুযায়ী প্রশ্নের মাপকাঠি ঠিক করা হল। এই বুদ্ধির মাপকাঠির নাম দেওয়া হল "বিনে-সাইমন মাপকাঠি"। এই মাপকাঠির নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হল। এরপর টারমান সাহেবের চেষ্টায় বুদ্ধি-পরিমাপের প্রণালীটি আরও সমৃদ্ধ হল ও অভিক্ষাটি পরিমার্জিত হল। ৩ বছর থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার জন্যে ৬ প্রকার, ১২ বছরের জন্য ৮ প্রকার, ১৪ বছরের জন্যে ৬ প্রকার পরীক্ষা-প্রণালী অনুসৃত হল।

এই তথ্যের অনেক খুঁটিনাটি আছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যেকের সত্যিকারের বয়স অনুযায়ী তার মনের বিকাশ হয় না। তাই তাঁরা মানসিক বা 'মানস বয়স' গণনার পক্ষপাতী। একটি সত্যিকারের বয়স, অন্যটি মানসিক-শক্তি উন্মেষের নির্দেশক বয়স (Mental age)। একটি ছেলের বা মেয়ের প্রকৃত বয়স যদি ১০ বছর হয় তবে তার মানস বয়স তার থেকে বেশী বা কম হতে পারে। বুদ্ধির এই মান পরীক্ষার জন্যে নানা অভিক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। যথা—

বিনে স্কেল ঃ

১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে—

(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখানো

(খ) সংখ্যার হিসাব

(গ) ছবি থেকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গুণে দেখানো

(ঘ) কোনো একটি ছোট বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা ইত্যাদি

টারম্যান স্কেল ঃ

১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে—

(ক) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখানো

(খ) পরিচিত বস্তুর নাম করা

(গ) ছবিতে আঁকা জিনিসের নাম করা, সংখ্যা বলা, ইত্যাদি

এইরূপ বিভিন্ন বয়সের জন্যে পরীক্ষার স্কেল আছে।

মানুষের বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্যে প্রকৃত বয়স দিয়ে মানস বয়সকে ভাগ করে তাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে দেখানো হয়। তবে কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃত বয়স ১৬ বছরের বেশী ধরা হয় না, কারণ বহু পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো গেছে যে, ১৬ বছর বয়সের পর কোনো ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না। উদাহরণ—কোনো ছেলের যদি প্রকৃত বয়স ১২ বছর ও মানস বয়স ১৫ বছর হয় তবে তার বুদ্ধি অঙ্ক হবে $\frac{১৫}{১২} \times ১০০ = ১২৫$

মানুষের বুদ্ধির এই অঙ্ক অনুসারে টারম্যান কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

যদি বুদ্ধির অঙ্ক (I. Q) ১৪০ ও তদূর্ধে হয় তবে সে অসাধারণ প্রতিভাবান্ বুঝতে হবে। সেইরূপ—

১২০-১৪০	প্রতিভাবান্
১১০-১২০	সাধারণের উর্ধ্বে
৯০-১১০	সাধারণ
৮০-৯০	অল্পবুদ্ধি
৭০-৮০	জড়বুদ্ধি
৭০ এর নীচে	বুদ্ধিহীন

শিক্ষার্থীদের জন্যে এই বুদ্ধি-পরীক্ষার বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমে যখন তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করতে চায় তাদের জন্যে ও পিতামাতার অবগতির জন্যেও এই অভীক্ষার প্রয়োজন।

কেবল বুদ্ধির পরীক্ষাই নয়, শিশুকে জানতে হলে, শিশুর অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব ও প্রবণতা জানার প্রয়োজন। তাই তার জন্যেও অভীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতা আছে। নানাভাবে শিশুর বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা করা যায়—

(ক) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে শিশু কী করতে ভালোবাসে বা বাড়িতে কী করতে ভালোবাসে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

(খ) শিশুকে নানা কাজ দিয়ে দেখতে হয় সে কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করে। এজন্যে কয়েকটি অভীক্ষার নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশ

শিক্ষাই জীবন—জীবনই শিক্ষা। তাই শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থি-জীবনের বিকাশে সহায়তা করা।

যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ রূপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় এইদিকেই শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি। একই রকম বৈচিত্র্যহীন শিক্ষার আয়োজন হয়তো প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন, শক্তি ও হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক। তা ছাড়া নানাকারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ হতে পারে। তাই শিক্ষায় নির্দেশের একান্ত প্রয়োজন। জগতে প্রত্যেকের নিজস্ব স্থান আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হল মূলমন্ত্র।

নির্দেশের অর্থ :—শিক্ষায় নির্দেশের দুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক আর একটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের পথে যে-কোনো সহায়তাকেই নির্দেশ বলা চলে। কে কোন বিষয়ে কেন পিছিয়ে পড়ছে, কে শ্রেণী-পাঠনকে কেন অনুসরণ করতে পারছে না এই সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দেশ বলা চলে।

আর কোন শিক্ষার্থীর কোন পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাধারা অনুসরণ করলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সবচেয়ে বেশী হবে ও তার জীবনে সাফল্য আসবে সেই

বিষয়বস্তু বা শিক্ষাধারা নির্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দেশের সংকীর্ণ অর্থ।

নির্দেশের প্রকারভেদ :—নির্দেশের বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকলেও শিক্ষায় নির্দেশ আজ শিক্ষাবিদদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু এই নির্দেশের সঙ্গে অন্যপ্রকার নির্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। যেমন, বৃত্তিমূলক নির্দেশ। ভাবী জীবনে যার যে বৃত্তি হবে গোড়া থেকেই সেই অনুযায়ী প্রস্তুতির সার্থকতা আছে। তাই শিক্ষায় নির্দেশ ও বৃত্তিমূলক নির্দেশের মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন। এ ছাড়া সামাজিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি নানা নির্দেশের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সব নির্দেশের শুরুতে আছে শিক্ষায় নির্দেশ।

শিক্ষায় নির্দেশের লক্ষ্য :

(ক) শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা।

(খ) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে সাহায্য করা।

(গ) নিজের রুচি, যোগ্যতা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিষয় ও শিক্ষাধারা নির্বাচন করা।

নির্দেশের বিশেষ অর্থ :—আজ আমাদের দেশে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর থেকেই রুচি, শক্তি ও পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবার প্রশ্ন উঠেছে। নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় শিক্ষালাভ করতে হবে, যদিও কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই জ্ঞানলাভ করতে হবে। যেকয়টি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকটি কারণে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে Science, Technical, ও Humanities-এর প্রবর্তন বেশী সম্ভবপর হয়েছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা ; কারণ যদি সব শিক্ষার্থীই তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের সুযোগ পায় সেটি কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। প্রথম সমস্যা হল নির্দিষ্ট ধারায় নির্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু, কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে ?

কি কি গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে ?

এই দুটি প্রশ্ন নির্দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কি কি গুণ বা বৃত্তি নির্দেশক হবে ?

আজও অনেকের মনে ধারণা যে, বোধ হয় বুদ্ধিই (Intelligence) পরিচালনার পথে প্রধান নির্দেশক। অবশ্য বুদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্বাচনের সময়ে প্রধান নির্দেশক বলে ধরে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল নির্বাচন ও নির্দেশ এক নয়। তা ছাড়া যখনই নির্দেশের কথা ওঠে, তখনই ভাবতে হবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকেই কোনো একটি ধারার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য। ভাবতে হবে আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং পল্লীবাসী। তাই এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিয়ে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয়, অথচ নির্দেশ সার্থক হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিকে প্রধান নির্দেশক বলে স্বীকার করে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্তমান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শক্তিরই পরিমাপ করা হয়। তা ছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ হয় আমাদের দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, সংখ্যা-বিজ্ঞান অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধির লোকই বেশী। এখন বুদ্ধি পরিমাপের পর যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধিগত পার্থক্য দেখা যায়, তবে সে পার্থক্য কি যথার্থ নির্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে ? তা হলেই দেখা যায় কোন বুদ্ধি অঙ্ক কোন ধারায় শিক্ষার নির্দেশক হবে, গবেষণা ছাড়া সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন।

অন্য কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে পারে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে বিভিন্ন সাফল্য অসাফল্যের সম্পর্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিষয়ানুরাগ ও প্রবণতার সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়ানুরাগ (Interest) ও প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি হিসেবে না নিলে বোধ হয় ভুল হবে।

বিষয়ানুরাগঃ—প্রবণতার সঙ্গে অনুরাগকে এক করে দেখলে ভুল হবে। কারণ প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন পল্লীবাসী, তার যান্ত্রিক প্রবণতা (Technical Aptitude) শিল্পাঞ্চলের অবস্থাপন্ন থাকের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সঙ্গে এক হবে না, তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ও জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি করলে দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। এইজন্যে এমন কোনো মূল উপাদান ভিত্তি করতে হবে যা অধিক অবস্থা-নিরপেক্ষ।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার সার্থকতা

জীবনের সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধির যতটুকু সম্পর্ক আছে তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বোধ হয় ব্যক্তিত্বের।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা আত্ম-প্রত্যয়ের বা অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যতই শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় ততই কৃতিত্ব দেখায়। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিষয়ে যার বিশেষ অনুরাগ সেই বিশেষ বিষয়ে শিখবার সুযোগ না পাবার জন্যে হয়ত বিশেষ সাফল্য দেখা যায় নি। কিন্তু বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে। ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালনা বা নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়ানুরাগের কথা মনে জাগে। তাই অধ্যবসায় ও বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

*বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি

এ পর্যন্ত যত বিষয়ানুরাগের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে। কিন্তু এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু কিশোরের মনোভাব, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান পাবার চেষ্টা করা হবে তার উত্তর দিতে হলে শিশু কিশোরগণের আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তুইটি গুণের অভাব দেখা যায়। তাই বিষয়ানুরাগ পরীক্ষায় এই নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। কোনো একটি পদ্ধতিই নির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তার কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। তাই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হতে গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই একসাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক ও পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

অভীক্ষা ১—ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়। প্রশ্নগুলি পড়ে শিক্ষার্থীর কোনটি পছন্দ কোনটি অপছন্দ বা কোন কাজ সে করবে, কোন কাজ না করবে তার উত্তর দেবে।

অভীক্ষা ২—এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের ওপর প্রণীত। যে বিষয়ে যার বিশেষ অনুরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে এই অনুমান করা হয়েছে। তাই এমন অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে থাকে যার উত্তর করতে হলে ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রে বিশেষ অনুরাগের প্রয়োজন।

অভীক্ষা ৩—এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ কয়েক রকমের কাজ থাকে। কোনোটি রঙ দেওয়া, বা বিন্দুযোগ করে কোনো কিছু আঁকা। আবার কোনোটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ান অংশগুলি কোথায় কোনটি লাগবে তা লিখে দেওয়া। মোটকথা অভীক্ষাটি

*অভীক্ষার পুর্ণ বিবরণ লেখকের শিক্ষা-প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কাগজে কলমে নেওয়া চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অনুযায়ী কাগজে কলমে যে-কোনো প্রকার কাজ করতে পারে।

অভীক্ষা ৪—এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুকরো টুকরো সংবাদ। যে যার রুচি অনুযায়ী সংবাদগুলির শীর্ষ পড়ে বিস্তারিত বিবরণী পড়বে ও পঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত করবে। অবশ্য সংবাদগুলির কোনোটি যন্ত্র, কোনোটি কৃষি, কোনোটি চারুকলা, কোনোটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র করে। মোটকথা ছয় রকমের অনুরাগকে কেন্দ্র করেই এই সংবাদগুলি রচিত ও যে যার বিষয়ানুরাগ অনুযায়ী পড়তে পারবে।

অভীক্ষা ৫—(**ফ্লাস কার্ড**) এই অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কার্ডে নানা বিষয়ের জিনিস আঁকা থাকবে। কার্ডটি মুহূর্তের জন্য দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে সে কি কি দেখেছে। প্রত্যেক কার্ডে অনেকগুলি করে জিনিস থাকবে। যদি ৮খানি কার্ড দেখানোর শেষে দেখা যায় যে একটি বিষয়ের জিনিসই শিক্ষার্থীর বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী লিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার বেশী অনুরাগ ধরা হবে।

এই হল বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্য উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা। তবে বিষয়ানুরাগ যাচাই করতে হলে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত জেনে নেওয়া প্রয়োজন ও যাতে মতামতগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল হয় তার জন্যে উপদেশ নির্দেশের প্রয়োজন।

নির্দেশের পদ্ধতি

নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিবিধ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যেমন :—

(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্যান্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ পর্যবেক্ষণ।

(খ) শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করে পরে তা থেকে নির্দেশের উপাদান সংগ্রহ করা।

(গ) অভীক্ষা-পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া।

(ঘ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ।

(ঙ) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ।

(চ) অভিভাবকদের মতামত সংগ্রহ।

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশ দিতে হবে।

কোন গুণ ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে তাও নির্দেশকের জানা থাকা দরকার। যেখানে তা জানা নেই সেখানে নির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

বাহ্যিক ব্যবহার বা চরিত্র থেকে অনেক সময় শিশুর বাস্তব রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই তার অবচেতন মনের তথ্য বিশেষভাবে সংগ্রহ করার প্রয়াস পেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন ও বন্ধুর মত ব্যবহার করা।

প্রতি বিদ্যালয়েই শিক্ষক-উপদেষ্টা (Teacher-Counseller) থাকবেন। শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ হবে খুবই দায়িত্বপূর্ণ। তার শিক্ষণকার্য কম থাকা প্রয়োজন। উপদেষ্টাকে খুবই মিশুক ও ক্ষমতা-সম্পন্ন হতে হবে।

শিক্ষক-উপদেষ্টার কাজ হবে—(ক) শিশুর তথ্য-সংগ্রহ করা ও তথ্য-বিশ্লেষণ করা;

(২) প্রধান শিক্ষক, শ্রেণী-শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা;

(৩) সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশুকে নির্দেশ দান করা।

মামুলী ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল দ্বারা শিশুর সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার মান নির্ধারণ করা যায় না। এই ত্রুটি

সংশোধনকল্পেই শিশুর ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন। অতীত ও বর্তমান ইতিহাস থেকে শিশুর মনের যথাসম্ভব পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে এবং আমাদের পক্ষে তার রুচি, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতির বিচার করা সহজ হবে। এখন এই কাজটি একদিন বা কয়েকদিনের কাজ নয়। বহুদিন যাবৎ শিশুর দৈনন্দিন কার্যাবলী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে, গৃহে, বন্ধুবান্ধব-মহলে ইত্যাদি বিবিধ পরিবেশে তার একাগ্রতা ও সামাজিকতার কি পরিচয় পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হই— (ক) শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগের অভাব, (খ) অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অন্তরায়, (গ) বিদ্যালয়বহির্ভূত জীবনের অনুসন্ধানে অসুবিধা, (ঘ) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের অভাব, (ঙ) ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব।

অনুমিত নির্দেশের সমস্যা

বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দেশের পথ সমস্যা-সমাকীর্ণ। যে সমস্যা এইক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র করে।

প্রথমতঃ—সুষ্ঠু নির্দেশের জন্যে বিদ্যালয়ে নানা কার্যকরী অভীক্ষার আয়োজনের অভাব। এই আয়োজন সময়-সাপেক্ষ, ফলে—বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বর্তমানে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ—অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক নির্দেশকের (Teacher Counsellor) নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন। অনেক সময় অভিভাবক অবস্থাপন্ন হলে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হয়ে উঠতে পারে। কারণ, যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চন-কৌলীন্য দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করবার প্রয়াস চলবে। ফলে যে বিজ্ঞান-শাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান-শাখায় ভর্তি করবার একটি দুর্দম প্রয়াস চলবে।

তৃতীয়তঃ—ভাবী জীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ অভিভাবকই বিজ্ঞান-শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে চাইবেন। ফলে একই শাখায় অসম্ভব ভিড় হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশ-প্রার্থীর সংখ্যা তদনুপাতে কম হবে।

চতুর্থতঃ—যে যে বিভাগে বা শাখায় ভর্তি হবে পরে সে শাখা তার ভালো না লাগলে বা যোগ্যতার পরিচয় না দিলে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই অল্প।

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্যা দেখা দেবে। কারণ কেউ যদি কৃষ্টিমূলক বিষয় নিয়ে পরে বিজ্ঞানে বা যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করতে চায় বর্তমান অবস্থায় তার পথ তখন রুদ্ধই থাকবে।

তা ছাড়া এই শিক্ষাধারা সত্যই কতদূর বৈচিত্র্যময় হবে সে বিষয়ে আজও সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়বস্তুর বোঝা প্রায় সকলকেই টানতে হচ্ছে—শুধু পার্থক্য হল তার নির্বাচনী বিষয়ের বেলায় (Elective Subject)। তবে কি সাধারণ পাঠ্যবিষয়ের সাথে সাথে নির্বাচনী বিষয় (Elective Subject) সংযোজিত হলেই তা বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের উপাদান হয়ে উঠবে?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে এই বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর ভাবী জীবনের সাথে সংহতির সমস্যাকে কেন্দ্র করে। কারণ যারা হয়ত যান্ত্রিক শাখায় বিশেষ শিক্ষালাভ করবে তারা কর্মজীবনে যদি সে জ্ঞান প্রয়োগ করবার সুযোগ না পায় তবে তাদের এই অর্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না।

আলোচনা ঃ—অনেকে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সংকোচক বলে মনে করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সংকোচিত করবার কোনো ইঙ্গিতই নাই, বরঞ্চ শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন করার আয়োজনই এর উদ্দেশ্য। তবে এই আয়োজনের যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্রমশঃ ধরা পড়বে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্তন ও পরিমার্জনও করার

প্রয়োজন হবে। অনেকের ধারণা যে সব বিদ্যালয় বর্তমানে বিবিধার্থ-সাধক নয় তাদের অবস্থা শোচনীয় হবে; কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যতদূর শোচনীয় হবে বলে মনে হচ্ছে ততদূর হবার কোনো কারণ নেই। কোনো অভিভাবকই তাঁদের সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না। ফলে যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি আছে তা বিবিধার্থ-সাধক না হলেও তাতে সাময়িকভাবে ভর্তি করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থ সাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাবে ও বহু বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী ও ভিন্ন শাখা সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং এ সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই। তারপর যদি এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি সুগম হয় তা হলেও এই সমাধান আরও সহজ হবে। তারপর যারা Humanities নেবে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই বিজ্ঞান বা যান্ত্রিক শাখায় যোগ্যতা নেই—ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর হলেই যে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হতে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে তার কোনো অর্থ নেই। তা ছাড়া দেশের কৃষ্টিমূলক শিক্ষার (Liberal Education) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে। সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে এই নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের বেকার সমস্যা। যাই হোক, যদি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন শাখায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষাশেষে একটি পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে বোধ হয় অভিভাবকদের কিছু সান্ত্বনা মেলে।

সমস্যার সমাধান করতে হলে নিম্নরূপ উপায়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

(১) বিদ্যালয়গুলিকে যদি "আবাসিক বিদ্যালয়ে" পরিণত করা যায় তা হলে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

যতদিন পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যালয় না হবে ততদিন শ্রেণী-শিক্ষক বা অন্য যে-কোনও শিক্ষকের উপর জনপ্রতি সীমাবদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে

পারে কুড়ি জন বা পঁচিশ জন) কয়েকজন ছাত্রের ইতিহাস বা তথ্য সংগ্রহের ভার থাকবে। তিনি অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং শিশুর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন।

(২) এ ব্যাপারে অভিভাবকের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। তার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষক-অভিভাবক-সম্মেলন এবং শিক্ষক কর্তৃক শিশুর গৃহ পরিদর্শন হলে ভাল হয়।

(৩) শিক্ষককেও শিশুর বিদ্যালয়-বহির্ভূত জীবনের সন্ধান নিতে হবে। এর জন্য শিশুর সহচরদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষক নিজেও শিশুর সঙ্গে মেলামেশা করে এবং বন্ধুর মত ব্যবহার করে অনেক অন্তর্নিহিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(৪) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং মাঝে মাঝে প্রতি শিশুর দৈহিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি লক্ষ্য করতে হবে। স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ব্যবস্থা না থাকলে কোনও বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কেবল পরীক্ষা করলেই হবে না—তার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে হবে এবং আত্মবিকাশের ধারা লক্ষ্য করতে হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

তিন-চার হাজার বছর আগে চীনদেশে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তবে বর্তমানের উন্নততর প্রক্রিয়ার কাছে সেটা হয়ত নগণ্য। প্রাচীন ভারতে প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অধিকাংশ জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যেই ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে পরীক্ষা পরিচালনা

করতেন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সে সময় প্রত্যেক ছাত্রকে জনসমক্ষে নিজের গবেষণার বিষয় সম্পর্কে বলতে হতে ও জনসাধারণের ইচ্ছানুরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠা করতে হত। লিখিত পরীক্ষার প্রচলন হয় এরও পরে। বিগত শতাব্দীতেই আমাদের বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সূচনা হয়।

পরীক্ষা-পদ্ধতিকে আমরা মোটামুটিভাবে লিখিত, মৌখিক ও কার্যিক (practical) এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এতে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে তিন রকমের লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথম রকমে প্রবন্ধাকারে নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। দ্বিতীয় রকমে বেশ কিছুদিন ধরে স্বাধীনভাবে বা কারুর কর্তৃত্বাধীনে থেকে গবেষণা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা। তৃতীয় রকম আধুনিক যুগের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বা objective test এতে পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে সংক্ষেপে 'হ্যাঁ', 'না' বা তলায় দাগ দিয়ে বহু ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক বিচার।

মৌখিক পরীক্ষা ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিচারে লিখিত পরীক্ষার থেকে বেশী কার্যকরী। পরীক্ষকরা ছাত্রদের সামনাসামনি পেয়ে বুঝতে পারেন তারা কতখানি জানে, আর কতখানি তাদের অজানা। প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয় বলে তাতে সময় ও শক্তি দুইই বেশী ব্যয়িত করা হয়।

কার্যিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করে পরীক্ষকের সামনে দেখাতে হয়। যেমন ভূগোলে ব্যারোমিটার পড়ে দেওয়া মাটির, কাজে কোনো কিছু তৈরী করে দেখান ইত্যাদি।

দলগত (Group), ব্যক্তিগত (Individual), performance (কার্যিক) ইত্যাদি নানা ধরনের পরীক্ষা আছে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে আমরা

যেমন একদিকে সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারি তেমনি পারি অর্জিত জ্ঞানের।

পরীক্ষার পদ্ধতিকে Internal ও External এই দুভাগে ভাগ করা যায়। Internal পরীক্ষাতে পাঠক্রম পদ্ধতি ও পরীক্ষক সবই পরিচিত। কিন্তু External-এ এ সবই থাকে অপরিচিত। বাইরের পরীক্ষায় স্বীকৃতি না পেলে বাইরের জগতে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। ঘরোয়া পরীক্ষাটা বাইরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্য

External পরীক্ষার উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ। এই ধরনের পরীক্ষাতে একটা মান থাকে। এই মানের সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার চলে। প্রত্যেক জ্ঞানেরই কতকগুলি ক্রম আছে। শিক্ষার্থীরা আশানুরূপভাবে সেই ক্রমগুলি অতিক্রম করেছে কিনা সেটা পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় ত্যাগের আগে একটা পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই পরীক্ষায় স্কুলে স্কুলে, জেলায় জেলায় ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়। এর ফলে তাদের পারস্পরিক উৎকর্ষের বিচার করা যায়।

পরীক্ষা শুধু শিক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করে না, তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। তাই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা কিছুদিন আগেও প্রবেশিকা নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ এই পরীক্ষার সাফল্য উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার দিত।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে মেধাবীদের বেছে নিতে পারা :যায়। ফলে দায়িত্বপূর্ণ পদে উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুবিধা হয়।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে স্কুলের কাজ ও শিক্ষকদের অধ্যাপনারও উৎকর্ষ-অপকর্ষের আভাস পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয় না।

পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি

আমাদের বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যয়ন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এখন পড়াটাকে তারা পরীক্ষায় ভাল করা বা পাশ করার উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছে। ফলে পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে ফাঁক থেকে যায়। External পরীক্ষাগুলোতে সাধারণত পরীক্ষকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা করে থাকেন। এইজন্য শিক্ষকরা ছাত্রদের ঠিক তেমনি করে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। তাই স্কুলের প্রস্তুতি (Test) পরীক্ষার পরের সময়টা ছাত্রদের কাটে পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘেঁটে। ছাত্ররা শুধু মুখস্থই করতে শেখে। আর সেই মুখস্থর-বিদ্যার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ নয়, কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ পর্যন্ত। এর ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কাজ করতে ছাত্ররা শেখে না, সুবিচার ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এবং উচ্চাদর্শ গড়ে ওঠে না। তাই এই ধরনের পরীক্ষা শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যারই পরীক্ষা হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার পরীক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা সুন্দরের অনুভব-ক্ষমতা দেয়। এইসব বিষয়গুলোর পরিমাপ বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি দিয়ে হয় না। পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত ক্ষমতার পরিমাপ পরীক্ষকরা করতে পারছেন না। তাই আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে। আবার শীর্ষস্থানাধিকারী ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত। বিচার হয় এখানে একটি মাত্র চরম পরীক্ষার সাহায্যে। সে পরীক্ষায় বহু ছাত্র নানা কারণে ব্যর্থ হতে পারে।

প্রশ্নের প্রস্তুতিতেও গোলযোগ থাকে। কারণ প্রশ্নগুলি যে ধরনের হয় তাতে পরীক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। সমস্ত বিষয়ের ওপর ভাসা ভাসা প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের দু-চারটে নমুনা

সংগ্রহ না করে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ করতে হয় তা হলে তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয় না। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারই দৈবের হাতে গিয়ে পড়েছে। কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন করা হয় তখন বেশীর ভাগ অধ্যায়ই বাদ পড়ে যায়। তাই অনেকে সমস্ত বই খুব ভাল করে পড়ে যে ফল পায় আগের দিন রাত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত প্রশ্ন পড়ে একই ফল পায়। ভাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নির্বাচন পরীক্ষকের নির্বাচনের সঙ্গে এক হয়, তাদের আর পরীক্ষার যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয় না। কিন্তু উল্টোটা যে ক্ষেত্রে হয় তার ফল সহজেই অনুমেয়। প্রশ্নগুলি অনেক সময় এমনভাবে তৈরী করা হয় যে সমস্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জানা উচিত সে সমস্ত বিষয়গুলো বাদ পড়ে যায়। আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলি হয় দুর্বোধ্য নয় দ্ব্যর্থবোধক। ফলে পরীক্ষক যে উত্তরটা চান সেটা অনেক পরীক্ষার্থীরা ধরতেই পারে না।

বর্তমান পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে। এতে অনেক ভাল ছাত্রও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাল করে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কারণ পরীক্ষা-কেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে জানা জিনিসও ভুল করে, কোনো প্রশ্ন নির্বাচন ঠিকভাবে করতে পারে না। আবার অতি সাধারণ ছেলে মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাল ফল করে। প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে ভাল করে গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা থাকা চাই। অনেকে সব জিনিস লিখেও ভাল করে গুছিয়ে না লেখার দরুন ভাল ফল করে না। আবার অনেকে ভাষার চটক দিয়ে উত্তরকে এমনভাবে সাজায় যে সমস্ত বিষয় না লিখেও ভাল ফল করে, কারণ শেষোক্ত দল পরীক্ষকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়।

পরীক্ষকরা নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হন না এবং হতে পারেন না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন আবার কেউ বা কঠোরতার ধার ধারেন না। আবার এক-একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ করেন, আবার কেউবা বিস্তৃত উত্তর পছন্দ করেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকদের

প্রকৃতি জানা থাকে না এবং জানলেও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের যুক্তি, বিষয়কে ভালভাবে সাজাবার ক্ষমতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষার দখল, বানান, হাতের লেখা প্রভৃতির জ্ঞানও প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব পরীক্ষকের মতামত এক নয়। তাই নম্বরও সকলে এক দিতে পারেন না। ফলে একই পরীক্ষার্থী একজনের কাছে কোন রকমে পাশ করে ও অন্যজনের কাছে ভাল নম্বর পায়।

পরীক্ষা ছাত্রদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। এর প্রভাব ছাত্রদের দেহ ও মনের ওপর খুব স্পষ্ট। ফলে পরীক্ষার ওপর ছাত্রদের একটা বিরাগ জন্মায়।

বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক কেউই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এখানে পরীক্ষাটা একটা ছাড়পত্র। যে ভাল ফল করে সে এই ছাড়পত্র নিয়ে যায় সরকারী চাকরির দরবারে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে। এইটুকুর জন্যেই যেন পরীক্ষার দরকার। পরীক্ষার যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেটা আমাদের দেশে সুস্পষ্ট নয়।

পরীক্ষার প্রয়োজন

পরীক্ষার বিপক্ষে যত কথাই বলা যায় না কেন পরীক্ষাকে যে নির্মূল করা যায় না এ বিষয়ে সকলেই একমত। পরীক্ষা শিক্ষাজগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের কথা। শিক্ষকদের কাজ কতখানি সাফল্য লাভ করেছে বা পরীক্ষার্থীরা কতখানি জ্ঞান লাভ করেছে তার পরিমাপ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার ফলে শিক্ষকরাও জানতে পারেন কোন্ ছাত্রের গ্রহণের ক্ষমতা কতখানি, উচ্চতর শ্রেণীতে স্থান পাবার অধিকার কার আছে কার নেই। অভিভাবকরাও জানতে পারেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে। তারা যে বিষয়ে কাঁচা সে বিষয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও

নিজেদের সম্বন্ধে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগে সুবিধা হয়। পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-নির্বাচনও সহজ হয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তুলনা করা যায়।

পরীক্ষা শুধুমাত্র সেই সময়ের পরীক্ষার্থীর ক্ষমতার পরিমাপ করে না তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচির আভাস দেয়। এর সাহায্যে তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করা যায়। প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা থাকে। পরীক্ষার সাহায্যে আমরা সেই ক্ষমতা খুঁজে বার করতে পারি।

পরীক্ষা যদি না থাকত তাহলে শিক্ষার্থীদের কাজের তাগিদ থাকত না, নিয়মনিষ্ঠ ভাবে কোন কিছুই তারা শিক্ষা করত না। পরীক্ষা যদিও তাদের সব সময় স্বেচ্ছায় কাজে প্রণোদিত করে না তবুও সাময়িকভাবে তাদের কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পরীক্ষার জন্য ছাত্ররা অধীত বিষয় নতুন করে অভ্যাস করে। ফলে পুনরনুশীলনে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দৃঢ় হয়।

পরীক্ষা ছাত্রদের বিষয়ের সামগ্রিক বিচারে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে সাহায্য করে।

শিক্ষণের ত্রুটি এবং পাঠক্রমের ত্রুটি নির্ণয় করতে পারে এই পরীক্ষা। এর ফলে শিক্ষক গতানুগতিক পদ্ধতি সংশোধন করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন, পাঠক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করতে পারেন, উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারেন ও মোট কথা শিক্ষানীতির সংস্কার করতে পারেন।

পরীক্ষার সংস্কার

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় পরীক্ষকদের ওপরে। পরীক্ষক হবার যোগ্যতা সকলের থাকে না, তাই সুপরীক্ষক-নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যিনি যে বিষয়ের পরীক্ষক হবেন তাঁর সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞান

তো থাকবেই উপরন্তু অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও থাকবে। কারণ পরীক্ষকের যদি পাঠক্রম ভালভাবে না জানা থাকে, অধ্যয়নের পদ্ধতি না জানা থাকে তাহলে পরীক্ষার্থীদের ওপর তিনি সুবিচার করতে পারবেন না। পরীক্ষকরা ছাত্রদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানবেন। পরীক্ষার্থীদের পরিবেশও তাঁদের চিন্তা করতে হবে। শহরের ছেলেকে ধানচাষের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করলে সে পারবে না কিন্তু গ্রামের ছেলে সহজেই পারবে। পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে ধারণা শিক্ষকমাত্রেরই থাকে। তাই তাঁরা উঁচুদরের প্রশ্ন করে পরীক্ষার্থীদের বিব্রত করবেন না।

পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষক অনেককে একটু বেশী পছন্দ করেন আবার অনেককে করেন না। পরীক্ষকরা এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব সংস্কার থেকে মুক্ত হবেন।

লিখিত পরীক্ষায় অনেকে ভাল ফল করতে পারেন না। সেজন্য লিখিতের সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ফল ভাল হয়। মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্রদের সপ্রতিভতা, ভাল করে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা প্রভৃতি ধরা পড়ে।

স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে কাজের একটা মূল্য আছে। পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের আগে এগুলো সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার। কেননা স্কুলের কাজ থেকে কার ক্ষমতা কতখানি এবং যোগ্যতা যে কতখানি তার কিছুটা জানা যায়। স্কুলের ভাল ছেলে হঠাৎ চরম পরীক্ষায় কোন কারণে অকৃতকার্য হল। এতে তার পরীক্ষাটা ঠিক হল না, বা খারাপ ছেলে হঠাৎ ভাল করল, এটা তার যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের রেকর্ড রাখা উচিত। তবে এই রেকর্ডে উল্লিখিত নম্বরগুলো যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের সময় এ কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন এমন হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের চিন্তার অবকাশ থাকবে। বই খুলে সামনে ধরে দিলেও পরীক্ষার্থীরা যাতে চিন্তা না করে উত্তর দিতে না পারে। ফলে ছাত্ররা মুখস্থ করার সুযোগ পাবে না। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয় সম্পর্কে

জ্ঞানের পরিমাপই নয়, পরীক্ষার্থী নিজে কতখানি চিন্তা করতে পারে তাও। প্রশ্ন নির্দিষ্ট, রহস্যমুক্ত এবং বুদ্ধিযুক্ত হবে। প্রশ্ন এমন হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার পদ্ধতিটা ধরা পড়বে। এর ফলে প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পদ্ধতিকে সংশোধন করতে পারে। ছাত্ররা যাতে ভাগ্যের দোহাই না দিতে পারে সেজন্য বাছা বাছা প্রশ্ন না করে সমস্ত বিষয়ের উপর ছড়িয়ে প্রশ্ন করতে হবে। এতে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন চয়ন সহজ হবে। প্রশ্নগুলির মান সমান রাখতে হবে।

নম্বর দেবার সময় পরীক্ষকদের যে নিরপেক্ষ হতে হবে একথা আগেই বলা হয়েছে। যেখানে একাধিক পরীক্ষক একই ধরনের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, সেখানে পরীক্ষকদের সম্মিলিতভাবে কয়েকটা নীতি নির্ধারণ করা উচিত। তাহলে নম্বর দেওয়া অনেকটা একই ধরনের হবে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর না দিয়ে A, B, C, D, E এইভাবে কাজ অনুসারে নম্বর ভাগ করে দেওয়া যায়। এতে একদিক থেকে স্থবিধে হলেও প্রত্যেক ছাত্রের ফল ক্রম অনুসারে সাজানো ও মানপত্র ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অস্থবিধে হয়।

আমাদের সনাতন পদ্ধতি কিছু সংস্কার করে তার সঙ্গে যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাগুলো চালানো যায় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারেনি বা যাদের স্কুল রেকর্ড ভাল নয় তাদের পক্ষে এই ধরনের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ ব্যবস্থা বহু পাশ্চাত্য দেশে আছে। যেন কলম্বিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিলেও স্কুল রেকর্ড ও বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল বিচার করে ছাত্র ভর্তি করা হয়।

শুধুমাত্র সনাতন পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রস্তুত ও পরীক্ষা গ্রহণ না করে নূতন ধরনের প্রশ্ন প্রস্তুত ও বিশেষ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কেননা আধুনিক Scholastic Testগুলোকে একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে নেওয়া যায় না। Intelligence Test পরীক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাপক। Scholastic test দিয়ে স্বোপার্জিত জ্ঞান মাপা যায়। External পরীক্ষায়

চিরন্তন পদ্ধতির সঙ্গে এ দুটো রাখতে পারলে ফল ভাল হয়। তবে স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার যদি সংস্কার করতে হয় তাহলে এই দুই পদ্ধতিই অপরিহার্য।

পরীক্ষা গ্রহণ এমনভাবে করা হবে যেন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার চাপ বুঝতে না পারে। কারণ বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রদের দেহ ও মনের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে এর চাপ সহ্য করা সম্ভব নয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্লান্ত দেহে যখন এরাই জীবনের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন অবসন্ন দেহমনের খুব কম শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। তাই সেখানে সাফল্যলাভ করা আর তাদের ভাগ্যে ঘটে না। সেইজন্য external পরীক্ষার সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। আমাদের দেশে আগে নিম্ন-প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এসব ব্যবস্থা এখন বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলোর বদলে যদি পরিদর্শকের ও প্রধান শিক্ষকের সাহায্যে মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা মাঝে মাঝে নেওয়া যায় তবে ফল ভাল হ'তে পারে। এই পরীক্ষার ফলের উপর মানপত্র দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের পরিদর্শকরা জানতে পারবেন কোন কোন ছাত্র বয়স অনুপাতে বেশী এগিয়েছে বা পেছিয়ে পড়েছে, এতে ছাত্রদের মান নিরূপণও সহজ হবে। এই সব পরীক্ষাতে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে বেশী প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

পরীক্ষাগ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বহু আলোচিত সমস্যা। বেশ কিছুকাল ধরে কি করে এর সংস্কার সাধন করা যায় সেদিকে শিক্ষা-ব্রতীদের দৃষ্টি পড়েছে। বর্তমানে Objective Testগুলি পরীক্ষা পদ্ধতিতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের Intelligence ও Standardised Testগুলি পরীক্ষার নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পুরনো ধরনের প্রবন্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণে নানা দোষ থাকলেও সম্পূর্ণভাবে কেউ একে বর্জন করেননি। বরং যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে বলে অনেকে এর পক্ষে রায় দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা

বিজ্ঞান বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তন চাইছে। ছাত্রদের রুচি ও প্রবৃত্তি পরিমাপের পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্কুলে নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হবে। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সেইজন্য শিক্ষকরা হবেন বিশেষ শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রাপ্ত। External পরীক্ষার যে সব ত্রুটি আছে তা স্থির করতে হবে। কারণ অনেকের মতে বাইরের পরীক্ষকের চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিলে ফল ভাল হয়। তাঁরা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Tests) :—

প্রত্যেক শিক্ষাই উদ্দেশ্যমূলক সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আমরা প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। এই ত্রুটি সংশোধনের অবশ্যই প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র এর অবসান ঘটে ততই আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে আমাদের যাচাই করতে হবে। কিভাবে আমরা মান নির্ধারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করব, এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার আবার তিনটি দিক উল্লেখযোগ্য—যথা (ক) **সত্যনিরূপণ ক্ষমতা** (Validity)

(খ) **নির্ভরতা** (Reliability)

(গ) **ব্যবহারিকতা** (Usability)

এর সবগুলি এক সঙ্গে গ্রহণ করে তার নাম দেওয়া যেতে পারে **মান নির্ধারণ** (Evaluation).

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) **স্মৃতি-বাচক** (Recall types) (২) **জ্ঞান-বাচক** (Recognition types).

স্মৃতিবাচক অভীক্ষা আবার দুই প্রকারের—(ক) সাধারণ স্মৃতি থেকে উত্তর দান।

(খ) পদপূরণ।

জ্ঞান-বাচক অভীক্ষার মধ্যে যেগুলি অধিকতর প্রচলিত সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) সত্যাসত্য নিরূপণ (Alternative Response)

(খ) বহুর মধ্যে একটি নির্বাচন (Multiple Choice)

(গ) পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান (Matching)

জ্ঞানবাচক অভীক্ষার মধ্যে যেগুলির প্রচলন কম সেগুলিকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) পুনর্বিন্যাস (Re-arrangement)

(খ) পরিচিতি (Identification)

(গ) সাদৃশ্যকরণ (Analogy)

(ঘ) অসত্য বিবৃতি (Incorrect Statement)

দ্বিতীয় খণ্ড

রাশি-বিজ্ঞান

দুই কাহিনী

দাক্ষী-পীর

প্রথম অধ্যায়

রাশি-বিজ্ঞান

রাশি-বিজ্ঞান (The Science of Statistics)

সৃষ্টির বৈচিত্র্য অসীম। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকৃতির বিকাশ। কিন্তু এই আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিকতার পরিচয় মেলে। প্রকৃতি রাজ্যে এই সুশৃঙ্খলা একত্বে পরিস্ফুট না হতেও পারে। কিন্তু বহুত্বে এই শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি দেখা যায়। গণনা এবং পরিমাপকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানের যে শাখাতে তথ্যাদি আলোচিত হয় তাকে রাশি-বিজ্ঞান বলা যায়।

সুতরাং পরিমাণ ও সংখ্যাই রাশি-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) বলেছেন—"যখন কোন সিদ্ধান্তকে সংখ্যায়ক পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়, তখন ঐ সিদ্ধান্তকে আংশিক ভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু যখন তা পরিমাপ করতে এবং সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারা যায় না তখন ঐ সিদ্ধান্ত অতি অস্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য নয়।"

রাশি-বিজ্ঞান রাশি বা সংখ্যা নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা রাশি-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। রাশি-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান। কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট সংখ্যামূলক তথ্য সংগ্রহ করে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নমুনা বা অংশক (Sample) থেকে আমরা সমগ্রককে জানবার চেষ্টা করি। কতকগুলি নমুনা নিয়ে আমরা তাদের প্রয়োজনীয় রাশি-তথ্য সংগ্রহ করি এবং রাশি-তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis) করে যে নমুনাঙ্কগুলি পাওয়া যায় তা থেকে আবার পূর্ণাঙ্কের অনুমান-মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। অবশ্য এই অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত সম্ভাবনা-শাস্ত্রের মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশি-বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি

রাশির সমষ্টি মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমগ্রকে জানবার একটা প্রচেষ্টা দ্বারা সমগ্রক সম্বন্ধে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

পরিসংখ্যান প্রণালীর উৎপত্তি—

প্রাচীনকাল থেকে মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিসংখ্যান প্রণালীর উৎপত্তি হয়। পরিসংখ্যান প্রণালীর নাম না থাকলেও, এর ব্যবহার কোন না কোন আকারে প্রচলিত ছিল।

সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নর-নারী যখন সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে বাস করত তখন আত্মরক্ষা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহজ জীবনযাপন, অর্থসমস্যা, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আরম্ভ করল। তখন থেকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানবের চিন্তাধারায় পরিসংখ্যান প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। দেশ বা রাজ্যের সামরিক ও আর্থিক শক্তির নির্ধারণের জন্যে গণশক্তি (Man power) এবং সম্পৎশক্তির (Material Strength) প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

ইংলণ্ডে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনধারার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংখ্যামূলক তত্ত্ব সংগৃহীত হ'তে থাকল এবং যুক্তি ও বিতর্ককে পরিসংখ্যানমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস দেখা দিল। তারপর সপ্তম শতাব্দীতে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেশের মৃত্যুহার সম্বন্ধে উন্নততর প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরম্ভ।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পরিসংখ্যানমূলক সিদ্ধান্তের কোন কার্যকরী সূত্র আবিষ্কৃত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বেলজিয়াম নিবাসী কুইটিলেট (Quetelet) পরিসংখ্যান প্রণালীর মূল সূত্রটি অনুধাবন করেন। সেই সূত্রটি হল **বৃহৎ সংখ্যকের সমতা** (Constancy of great numbers).

প্রায় সমান বয়সের পাঁচ হাজার বাঙ্গালী যুবকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা গেল। এদের সকলেই প্রায় এক রকম পরিবেশের মধ্যে বাস করে। আকস্মিক কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি জনিত বিপর্যয় অবস্থা উপস্থিত হয়নি ধরে নেওয়া হ'ল। এই **একলক্ষ** পাঁচ হাজার লোককে এক হাজারের পাঁচটি দলে বা অংশকে বিভক্ত করা হল।

ধরা যাক এক হাজার লোকের প্রত্যেক দলের প্রত্যেকের মৃত্যুকালীন বয়সের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল। আমরা কোন বিশেষ লোকের মৃত্যুকালীন বয়স (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) আগে থেকেই বলতে পারি না বটে ; কিন্তু দেখা যায় যে দশটি অংশকের প্রত্যেক দশ হাজার লোকের মৃত্যুকালীন বয়সের সমষ্টি প্রায় অভিন্ন।

বীমা কোম্পানিতে অতীতের মৃত্যু হারের গত হিসাবের উপর নির্ভর করে প্রিমিয়াম তালিকা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

কোন পরিসংখ্যানবিদ্ সত্যই বলেছেন যে, পরিসংখ্যান সাহায্যে কোটি কোটি তথ্য থেকে আমরা পৃথিবীর **মহাগড় বিধান** নির্ণয় করতে সমর্থ। সংখ্যাই পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের মূলভিত্তি, কিন্তু অতি বৃহৎ সংখ্যার আলোচনা ও ধারণা চিন্তাশক্তির পক্ষে কষ্টকর, এমন কি অসম্ভব। দশ সহস্র বা বিশ সহস্র লোকের দৈহিক উচ্চতা, ওজন প্রভৃতির সামগ্রিক ধারণা মনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বৃহৎ সংখ্যকের সমষ্টিগতভাবে গত-কল্পনা মনের পক্ষে সহজতর। গড় প্রকৃতপক্ষে বহুত্বকে একত্বে পরিণত করে।

মাত্র গড়ের উপর নির্ভর করে আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর নয়। গড় থেকে সমগ্র আলোচ্য সংখ্যার শতকরা কত অংশের নৈকট্য বা দূরত্ব কিরূপ তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। লেখ সাহায্যে বিষয়গুলি স্পষ্টতরভাবে চাক্ষুষ অনুভূতির সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়। পরিসংখ্যানের লেখ-মূলক সহজ আলোচনার দ্বারা পরিস্ফুট উপস্থাপন প্রণালী প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হবে।

রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

পরিকল্পনা—বর্তমান যুগে, ভারত রাষ্ট্রকে দেশের সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের জন্য ধাপে ধাপে সুষ্ঠ পরিকল্পনার (Planning) উপর ভিত্তি ক'রে অগ্রসর হতে হবে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ, একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা, বর্তমান অবস্থা থেকে আরও কত উন্নততর অবস্থায় পৌছানো যায়, কত হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংখ্যার বর্ধিত হারের সহিত সমতা রক্ষা করতে হলে কি হারে উৎপন্ন দ্রব্য বাড়াতে হবে, এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে উপযুক্ত কত জনশক্তি (Man power) এবং যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন ইত্যাদি সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যানের অবদান অসামান্য।

আইন প্রণয়ন—দেশের আইন প্রণয়নেও পরিসংখ্যানের প্রয়োজন। কোন বিশেষ আইন, দেশের শতকরা কত লোকের পক্ষে হিতকর, শিক্ষা, কৃষি, কর্মসংস্থান, রাজ্যকর বর্ধন প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইনের যুক্তিযুক্ততা কত তাহা পরিসংখ্যান সাহায্যে নির্ণয় করা বিধেয়। এক বা কয়েক ব্যক্তির মতামত দেশের ও দশের পক্ষে কতখানি উপযোগী সংখ্যাত্মক হিসাবই তার প্রধান নির্দেশক।

বাণিজ্য ও শিল্প—বাণিজ্য ও শিল্পে পরিসংখ্যান অপরিহার্য। কোন শিল্পজাত দ্রব্যের কিরূপ চাহিদা, দেশের বিভিন্ন অংশে চাহিদার তারতম্য কিরূপ, বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কোন্ দ্রব্যের কিরূপ চাহিদা, কোন্ বিভাগে কত জনশক্তি নিয়োগ করা যায়, কোন্ প্রণালীতে অল্প খরচে বেশী উৎপন্ন হতে পারে ইত্যাদি বহু বিষয়ের পরিসংখ্যানমূলক গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হলে, ব্যবসায়ে বা শিল্পে অর্থনিয়োগ নিরাপদ, অন্যথায় বেহিসাবী প্রচেষ্টায় অসংখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়।

বীমা কোম্পানী মৃত্যু এবং মৃত্যুকালীন বয়সের একটা গড়হিসাবের উপর তার প্রিমিয়াম-হার নির্ধারণ করে এবং অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট বিষয়ে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ভেষজ-বিজ্ঞান—বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে কোন বিশেষ ঔষধ কোন বিশেষ রোগে ফলপ্রদ কার্যকারিতা কত তার প্রয়োগ ও ফলাফলের সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা বিধেয়। দুই একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন ঔষধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া বিপজ্জনক, কারণ ঐ ক্ষেত্রে ফলাফল আকস্মিকও হতে পারে।

কৃষি—বর্তমানে খাদ্যসংকট ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা দ্বারা, কোন্ জমিতে কিভাবে চাষ করলে, কি রকমের সার কত হলে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কত হারে বাড়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের পরিসংখ্যানমূলক গণনা ও পরিমাণ দ্বারা একটা হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করতে ব্রতী হয়েছেন। এই প্রচেষ্টা সফল হলে দেশের সমস্ত কৃষিকার্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে আশা করা যায়। এর দ্বারা কৃষিযোগ্য ভূমি ও উৎপন্ন ফসল এই দুয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হবে।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ই অত্যন্ত জটিল বিষয়। লোকসংখ্যা, মৃত্যুর হার, বয়স হিসাবে দৈহিক উচ্চতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যেমন প্রকৃত গণনা ও পরিমাপ দ্বারা স্থির করা যায়, মানসিক বৃত্তিগুলির সেইরূপ প্রত্যক্ষ সংখ্যাত্মক পরিমাণ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিশেষ কার্যকরী।

কোন্ কোন্ বয়সের বা কোন্ কোন্ প্রচলিত শ্রেণীর শিক্ষামান নির্ণয়ের জন্য কিরূপ প্রশ্নপত্র হওয়া উচিত, কিরূপে প্রশ্নপত্রকে আদর্শ প্রশ্নপত্রে পরিণত করা যায় কিরূপ প্রশ্নপত্র হলে সমস্ত পরীক্ষকই একরূপ নম্বর দেবেন, ইত্যাদি বহু জটিল বিষয়ে পরিসংখ্যান একান্ত অপরিহার্য। পরিসংখ্যান প্রণালীর সাহায্যে বুদ্ধিমান মনের বিভিন্ন স্বাভাবিক বৃত্তি প্রভৃতির একটা সংখ্যাত্মক মান নির্ণয় করবার প্রচেষ্টায় পরিসংখ্যান বিশেষ সহায়ক। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থী তার মনের স্বাভাবিক বৃত্তির বিশিষ্ট বিষয়ে উৎকর্ষের সন্ধান পাবে এবং জাতীর অপচয় হ্রাস করা সম্ভবপর হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিমাপ প্রণালী

পরিমাপ—কোন কিছুর পরিমাপ করার অর্থ সমজাতীয় ক্ষুদ্রতর বস্তুর সহিত তুলনা করা। একটি বালকের দৈহিক উচ্চতার পরিমাপ করতে হলে ফুট বা ইঞ্চির সাহায্যে তা নির্ণয় করতে হয়। ধরা যাক, একটি বালকের উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। কিন্তু প্রকৃত উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি অপেক্ষা কম বা বেশী হতে পারে। একেবারে সূক্ষ্ম মাপ কার্যতঃ অসম্ভব। এজন্য যথাসম্ভব শুদ্ধ আসন্নমাপে পরিমাপ নেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু সাধারণ ভগ্নাংশে পরিমাপ হলে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অতিশয় জটিল হতে পারে। এইজন্য দশমিকে পরিমাপ নেওয়া অধিকতর সুবিধাজনক এবং এতে মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত কম হয়।

অতি বৃহৎ সংখ্যক পরিমেয় বস্তুর কোন বিশেষ ধর্মের পরিমাণ নির্ণয়ে অনেক রকম অসুবিধা আছে। যেমন, কোন প্রদেশের লোকসংখ্যা গণনা করতে হবে। এতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। বহু প্রচেষ্টায় গণনা নির্ভুল ভাবে সংগৃহীত হলেও বাস্তবের সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য থেকে যেতে পারে। যদি গণনা-কাজে ছয় মাস সময় যায়, তাহলে এই ছয় মাসের মধ্যে কয়টি জন্ম-মৃত্যু ঘটতে পারে।

আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে যার প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। যেমন গায়ের রং, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি গুণগুলির শুদ্ধভাবে সংখ্যাত্মক পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব।

এইরূপ অনেক ধর্ম বা গুণ আছে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। যেমন দৈহিক উচ্চতা, মস্তকের দৈর্ঘ্য, বুদ্ধি, (নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত) ইত্যাদি গুণগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল।

এইরূপ পরিবর্তনশীল গুণসমূহকে **পরিবর্তনযোগ্য** বা চলক (Variables) বলা যেতে পারে।

পরিসংখ্যা নিবেশন (Frequency Distribution)

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে পরিবর্তন-যোগ্য কোন বিশেষ গুণ বা ধর্ম নির্দিষ্ট দুটি সময়ে এক অবস্থা থেকে অন্যরূপ অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। একের পক্ষে যেরূপ ঘটে থাকে বহুর পক্ষেও সেইরূপ ঘটে থাকে এবং এই পরিবর্তনের ধারা সকলের পক্ষেই সমান নয়। পরিসংখ্যান বিজ্ঞান কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির কোন বিশেষ ধর্মের আলোচনা করে না। সমঅবস্থায় সমধর্মীয় গোষ্ঠীর (Group) আলোচনা থেকে ঐ গোষ্ঠীর প্রায় সকলের পক্ষে প্রযোজ্য ধর্মের অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের চেষ্টা করে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে পরিমেয় গোষ্ঠীর কতক অংশ বা শতকরা কতক সংখ্যক বিশেষ স্তরে সমধর্মী বা সমপর্যায়ভুক্ত। এদের সংখ্যাই হল পরিসংখ্যান (Frequency).

তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data)

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যপুঞ্জের উপর নির্ভর করে। তথ্য যত বেশী হবে সিদ্ধান্তও তত বেশী সত্য বা নির্ভরযোগ্য হবে। আবার তথ্যের পরিমাণ বা সংখ্যাই যথাসম্ভব শুদ্ধ সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এইজন্যে যথাসম্ভব শুদ্ধ বা নিভু'ল তথ্য সংগ্রহই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের প্রাথমিক উপাদান।

নানা উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত উপায়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) প্রত্যক্ষভাবে বিষয়বস্তুর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

(খ) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সর্বত্র সম্ভব না হলে সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, সরকারী রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(গ) আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নাকারে ছেপে (Question Blank) বহু উত্তর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের সাহায্যে নানা রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

এইরূপ প্রশ্নপত্রে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন থাকবে, যুক্তি বা বিচার-মূলক কোন প্রশ্ন থাকবে না, প্রত্যেক প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর থাকাই বাঞ্ছনীয়, ইহাতে দ্ব্যর্থক উত্তরের কোন অবকাশ থাকবে না। প্রশ্নের ভাষা সরল এবং সহজবোধ্য হবে।

শ্রেণী-বিন্যাস এবং ছক-বিন্যাস (Classification and Tabulation)

সমগ্রকের যে গুণটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে চাই সেই গুণের প্রতীকস্বরূপ কতিপয় অংশক বেছে নিতে হবে। ঐ অংশকগুলির রাশি তথ্য সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণী-বিন্যাস বা সারীকরণ (Classification) করতে হবে। এই সারীকরণের উদ্দেশ্য হল রাশিতথ্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টতর আকারে উপস্থাপিত করা। এর জন্যে প্রয়োজন ছক-বিন্যাস বা তালিকা প্রণয়নের। উচ্চ ও নিম্ন বিভাগ-সীমার মধ্যবর্তী অংশকে প্রয়োজনমত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক সীমার অন্তর্গত পরিসংখ্যান নির্ণয় করে যে ছক প্রস্তুত হবে তাই হবে পরিসংখ্যান ছক।

ধরা যাক, এক থেকে চার বৎসর বয়স্ক দশটি শিশুর বাক্‌স্ফুরণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হল, অর্থাৎ জন্ম থেকে এক বৎসরের মধ্যে, এক বৎসর ,থেকে দুই বৎসরের মধ্যে, দুই বৎসর হতে তিন বৎসরের মধ্যে এবং তিন বৎসর হতে চার বৎসরের মধ্যে কয়েকটি শিশু স্পষ্ট করে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট মানমত কথা বলতে পারে তার একটি পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষার ফল অনুসারে নিম্নলিখিতরূপে একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

0—1 বৎসরের মধ্যে	1—2 বৎসরের মধ্যে	2—3 বৎসরের মধ্যে	3—4 বৎসরের মধ্যে
	।	।।।।।।।	।

উক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে—

(1) এক বৎসরের মধ্যে কোন শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি।

(2) 1—2 বৎসরের মধ্যে দুইটি শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি হয়েছে।

(3) 2—3 বৎসরের মধ্যে সাতটি শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি হয়েছে।

(4) 3—4 বৎসরের মধ্যে একটি শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি হয়েছে।

বহুসংখ্যকের তালিকা প্রস্তুতের একটি আদর্শ নিম্নে দেওয়া হল। মনে করা যাক যে কোন শ্রেণীর ৬৫টি বালকের গণিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণীর অন্তর Class interval	সংখ্যা মিলান Results of checking	পরিসংখ্যান Frequency
191—200	॥।	3
181—190	॥॥ ॥॥ ॥॥	14
171—180	॥॥ ॥॥ ॥॥ ॥॥	20
161—170	॥॥ ॥॥ ॥।	13
151—160	॥॥ ॥।	8
141—150	॥॥	5
131—140	॥	2

মোট—65

উক্ত ছক-বিন্যাস প্রস্তুত প্রণালী

পরীক্ষান্তে দেখা গেল সর্বোচ্চ নম্বর 191—200 এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন 131-140 এর মধ্যে। সুতরাং প্রাপ্ত নম্বরগুলিকে 131-140, 141-150, ... 191-200 ইত্যাদি 7টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হল। এখন, 191-200

নম্বরের মধ্যে যে যে বালক নম্বর পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে উল্লম্ব (Vertical) রেখা টানা হল। ঐ ঘরে 3টি দাগ পড়েছে। সুতরাং তাদের সংখ্যা বা আবৃত্তি হল 3। সেইরূপ 181-190 এর মধ্যে 4টি ছাত্রের জন্য 4টি রেখা এবং পঞ্চম ছাত্রটির জন্য ঐ চারিটি রেখাকে অনুভূমিকভাবে (Horizontally) ছেদ করিয়ে পঞ্চম রেখাটি টানা হল, ঐ ঘরে এইরূপ দুইটি থাক হয়ে আরও চারিটি রেখা পড়ল। সুতরাং ঐ শ্রেণীর সংখ্যা হল $5 \times 2 + 4 = 14$। এইভাবে সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা নির্ণয় করা হল।

ধরা যাক কোনো জেলার বিভিন্ন বয়সের বালিকাদের দৈহিক উচ্চতার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকা পূর্ব তালিকা থেকে অধিকতর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয়েছে। কারণ কয়েক সহস্র বালিকার উচ্চতার হিসাব সহজে বুঝবার জন্য গড় হিসাব নেওয়া হয়েছে।

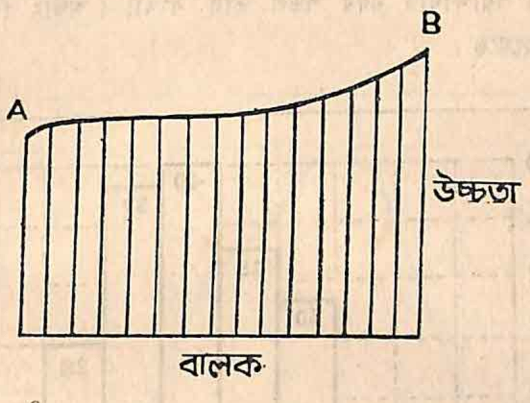
বয়স হিসাবে শ্রেণীঅন্তর	বালিকার সংখ্যা	গড় ও উচ্চতা (ইঞ্চিতে)
8—9	2455	45·3
15—16	2580	40·2
23—24	2178	56·1
	7213	

লেখ-সাহায্যে পরিসংখ্যান নিবেশন (Graphical representation of frequencies).

ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা রেখা (Ogive Curve).

কোনো স্থানের কোনো বিশেষ বয়সের, বহুসংখ্যক বালকের দৈহিক উচ্চতার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল। দেখা যাবে এই উচ্চতার

পরিমাণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। যার দৈহিক উচ্চতা সর্বাপেক্ষা কম সর্ববামে দাঁড় করিয়ে পর পর অধিকতর উচ্চ বালকদিগকে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে গেলে এবং তাদের মাথার উপর দিয়ে একটি রেখা কল্পনা করলে তা (নিম্নের চিত্রানুরূপ A B) একটি বক্র রেখায় পরিণত হবে।



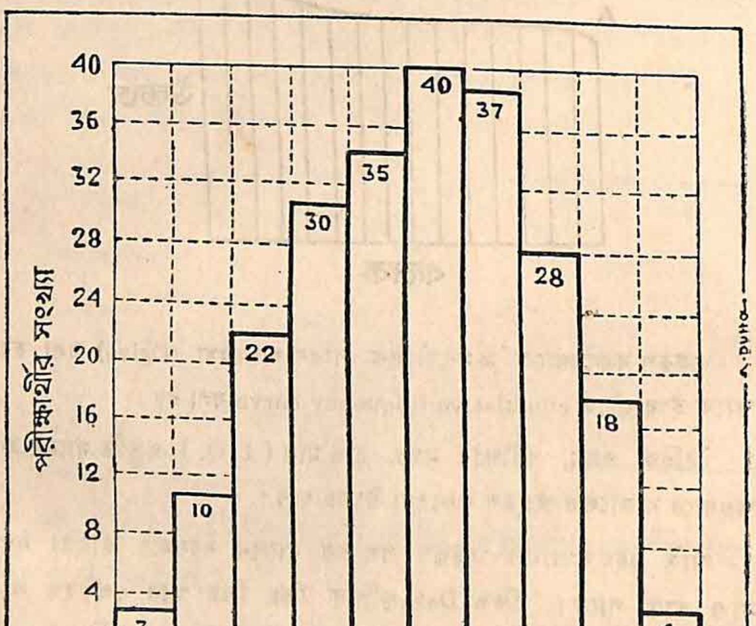
এইরূপ বক্ররেখাকে ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা-রেখা (Ogive) বলা হয়। তাকে ইংরাজীতে cumulative frequency curve বলা হয়।

দৈহিক ওজন, পরীক্ষার নম্বর, বুদ্ধি মান (I. Q.) প্রভৃতি মানের ক্রম অনুসারে সাজালেও অনুরূপ বক্ররেখা উৎপন্ন হবে।

অতি বৃহৎ সংখ্যাকে এইরূপ পর পর সাজান সবসময়ে কার্যতঃ সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু Dataগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শ্রেণীবদ্ধ করে প্রত্যেক স্তরের পরিসংখ্যান (frequency) অনুসারে স্তম্ভ-লেখ অঙ্কিত করলে নির্ণেয় তথ্যের প্রকৃতি অধিকতর সহজবোধ্য হয়। এই প্রণালীতে প্রত্যেক স্তম্ভের পরিসর অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরের ব্যবধান সমান রাখতে হবে। সুতরাং স্তম্ভের মাত্র উচ্চতা দ্বারাই প্রত্যেক স্তরের পরিসংখ্যান সূচিত হবে।

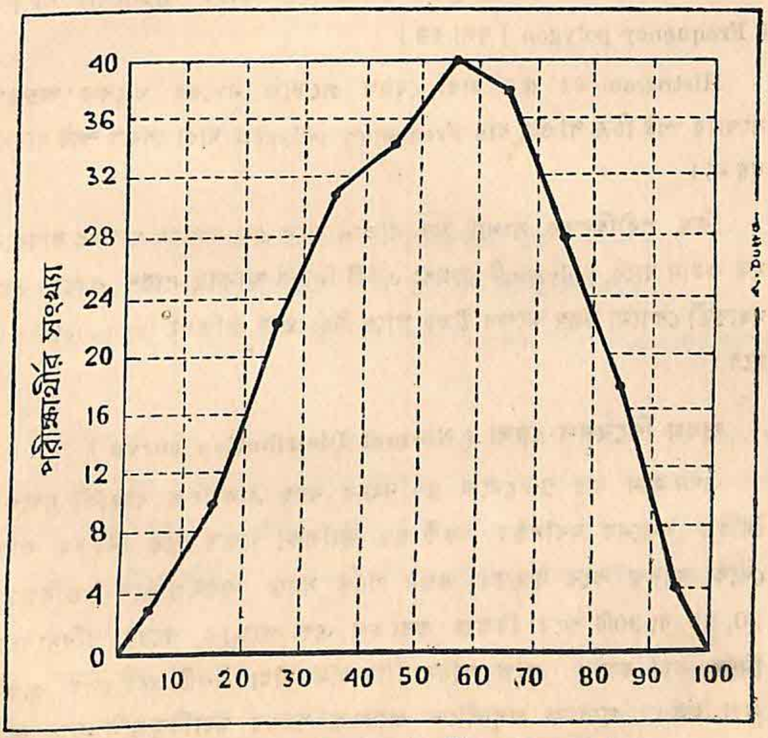
আয়ত লেখ (Histogram)

এও এক প্রকারের আয়ত-লেখ (Column Diagram). একটি উদাহরণের সাহায্যে histogram অঙ্কন প্রণালী দেখান গেল। ইতিহাসের পরীক্ষায় 0 হইতে 100 নম্বরের মধ্যে যত সংখ্যক ছাত্র যে যে নম্বর পেয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু এতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের পরিবর্তে দশের থাকে নম্বরগুলিকে বিভক্ত করে প্রত্যেক থাকে কতজন করে পরীক্ষার্থীর নম্বর পড়ল তার সংখ্যা (অর্থাৎ frequency) নির্ণয় করা হয়েছে।



আয়ত লেখ (Histogram)

নম্বর			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
0—9	...	...	3
10—19	...	...	10
20—29	...	...	22
30—39	...	...	30
40—49	...	...	35
50—59	...	...	40
60—69	...	...	37
70—79	...	...	28
80—89	...	...	18
90—100	...	...	4
			227



Frequency Polygon (পরিসংখ্যা বহুভুজ)

প্রত্যেক স্তম্ভের বিস্তার সমান, স্থতরাং প্রত্যেক স্তম্ভের উচ্চতা (স্থতরাং ক্ষেত্রফল) দ্বারা স্তম্ভের পাদদেশে লিখিত নম্বর দুইটির মধ্যে যত পরীক্ষার্থী আছে অর্থাৎ যত পরীক্ষার্থী এই দুই সীমার মধ্যে নম্বর পেয়েছে তাদের সংখ্যা স্থচিত হচ্ছে। স্তম্ভ-লেখ-এর সমগ্র ক্ষেত্রফল দ্বারা মোট ছাত্র সংখ্যা স্থচিত হল।

পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency polygon)

এমন প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যবিন্দুগুলি O বিন্দু থেকে আরম্ভ করে পর পর ভাগ করে গেলে যে বহুভুজটি উৎপন্ন হয় তাকে পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency polygon) বলা হয়।

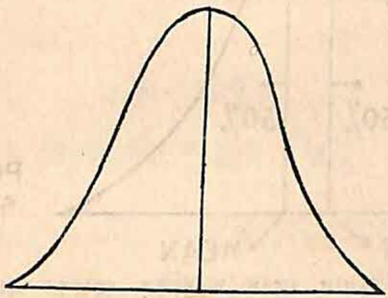
Histogram-এর স্তম্ভ দ্বারা যেরূপ প্রত্যেক নম্বরের থাকের অনুরূপ সংখ্যার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় Frequency polygen দ্বারা সেরূপ স্পষ্ট ধারণা হয় না।

কিন্তু পরীক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়ান যাবে এবং নম্বরের থাকের ব্যবধান যত কমান যাবে, polygonটি ক্রমশঃ একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে এবং মধ্যবর্তী কোনো উল্লম্ব অক্ষের উভয় পার্শ্বে উহা প্রায় প্রতিসম (symmetrical) হবে।

স্থষম নিবেশন রেখা (Normal Distribution curve)

এখন মনে কর 20 থেকে 25 বৎসর বয়স্ক লক্ষাধিক বাঙ্গালী যুবকের দৈহিক ওজনের যথাসম্ভব একটি শুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করে নিম্নতম ওজন থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম ওজন পর্যন্ত সমস্ত ওজনগুলিকে স্থবিধামত 20, 25, বা 30টি স্তরে বিভক্ত করা হল এবং প্রত্যেক স্তরের পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হল। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান-মান দ্বারা একটি স্তম্ভ-লেখ প্রস্তুত করা হল। পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যবিন্দুগুলি যুক্ত করে প্রথমতঃ তাকে আবৃত্ত বহুভুজে পরিণত করে parabolaর ন্যায় একটি

বক্র রৈখিক-লেখে পরিণত করতে হয়। চিত্র থেকে দেখা যাবে ওটা নিম্নরূপ একটি বক্র রৈখিক লেখে পরিণত হয়েছে এবং উক্ত লেখ-এর বামে ও দক্ষিণে দুইটি শাখা মধ্যবর্তী একটি উল্লম্ব রেখার উভয় পার্শ্বে প্রায় প্রতিসম হয়েছে।



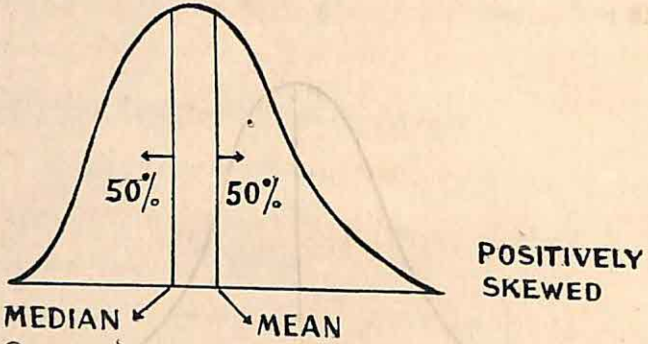
আলোচ্য তথ্য যত বেশীসংখ্যক থাকবে এবং যত নির্ভুলভাবে সংগৃহীত হবে, বক্ররেখাটি মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে ততবেশী প্রতিসম হবে।

এই বক্ররেখাটিকে সুষম নিবেশন রেখা Normal Distribution Curve, Probability curve, বা curve of error বলা হয়।

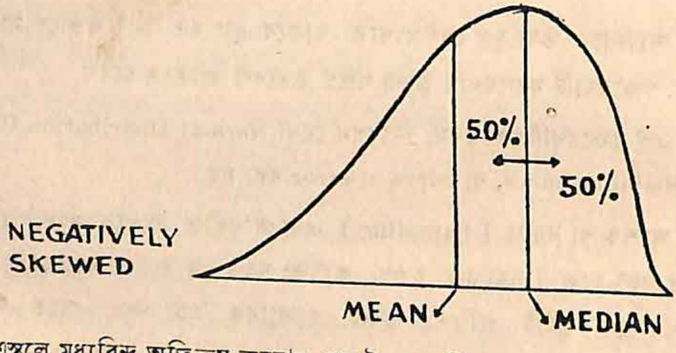
অংশক বা নমুনা (Sampling) এবং সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যা (data) অতি বৃহৎ হলে (সর্বাত্মক হওয়া কার্যতঃ সম্ভব নয় বলে) মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে শাখা দুইটি প্রতিসম হওয়া স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে। এইজন্য ঐ বক্ররেখাটিকে Normal Frequency Curve বা Probability Curve বলা হয়।

উক্ত সুষম রেখাটি যৌগিক গড় বা পাটীগণিতীয় গড়ের উভয় দিকে প্রতিসম একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা যা উভয় দিকে সীমাহীন ভাবে পরিব্যাপ্ত।

উক্ত আকারের কোনো বক্রলেখ-এর উচ্চতম বিন্দু থেকে অঙ্কিত কোনো উল্লম্ব সরল রেখার উভয় পার্শ্বে বক্রশাখা দুইটি প্রতিসম (Symmetrical) না হলে তাকে অসমপক্ষ রেখা (Skewed Curve) বলা হয়।



মধ্যবিন্দুতে পৌছবার পূর্বেই আবৃত্তির বৃহত্তর অংশ শেষ হয়েছে। এস্থলে অসমপক্ষতা দক্ষিণায়ত (Positively Skewed).



এস্থলে মধ্যবিন্দু অতিক্রম করবার পরেই আবৃত্তির বৃহত্তর অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এস্থলে অসমপক্ষতা বামায়ত (negatively skewed).

কতিপয় সংখ্যক পরীক্ষার্থীর কোনো বিষয়ের নম্বরের তালিকা থেকে একটি বক্রলেখ অঙ্কিত করলে ঊর্ধ্বতম কত সংখ্যক ছাত্র কোন স্তরের নম্বর পেয়েছে নির্ণয় করা যাবে।

বক্রলেখটি উচ্চতম বিন্দু থেকে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখার উভয় পার্শ্বে প্রতিসম হলে বুঝতে পারা যাবে যে সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী গড় নম্বর অর্থাৎ 50% নম্বর পেয়েছে। নম্বরের মানের ক্রম হিসাবে মধ্যবর্তী পরীক্ষার্থীর নম্বর 50.

এই সমস্ত বক্রলেখ হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মধ্যগামিতা বা কেন্দ্রাভিমুখতাই (central tendency) এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যগামিতার মান নির্ণয়

(Measure of Central Tendency)

কোনো রাশিতথ্যকে লেখ আকারে প্রকাশ করলে রাশি-তথ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা জন্মে। কিন্তু রাশি-তথ্যের পরিসংখ্যা নিবেশনের বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সম্বন্ধে আরও স্পষ্টতর ধারণা জন্মাতে পারে। কোনো রাশিতথ্যের পরিসংখ্যানের মধ্যগামী মান দ্বারা অংশকের তথা সমগ্রকের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্টতর হয়।

বিভিন্ন প্রণালীতে মধ্যগামী মান নির্ণয় করা হয়। তন্মধ্যে যৌগিক গড় (Mean বা arithmetic mean) মধ্যম-মান (Median) এবং ভূয়িষ্ঠক (Mode) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটির মধ্যে আবার যৌগিক গড় সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

যৌগিক গড়—পরীক্ষার নম্বর, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতির সাংখ্যমানের পাটীগণিতীয় গড়কে যৌগিক-গড় (Mean) বলা হয়। যৌগিক গড় নির্ণয় প্রণালী উদাহরণ সাহায্যে দেখান হল।

উদাহরণ:—কোনো শ্রেণীর 25টি ছাত্রের ইতিহাসের পরীক্ষার নম্বরের একটি তালিকা দেওয়া হল, ঐ শ্রেণীর ইতিহাসের নম্বরের যৌগিক গড় বা Mean নির্ণয় করতে হবে।

পরীক্ষার্থীদিগকে A, B, C, D অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হল এবং প্রাপ্ত নম্বর শতকরা হারে প্রদত্ত হল।

পরীক্ষার্থী	প্রাপ্ত নম্বর (%)	পরীক্ষার্থী	প্রাপ্ত নম্বর (%)
A	30	N	64
B	65	O	60
C	72	P	38
D	61	Q	30
E	63	R	25
F	60	S	66
G	63	T	45
H	57	U	45
I	42	V	35
J	35	W	42
K	55	X	12
L	80	Y	15
M	48		477
13	731		731
		12	1208

∴ যৌগিক গড় বা mean $= 1208 \div 25 = 48{\cdot}03$

Mean বা গড়কে M দ্বারা, নম্বর বা Score-কে X দ্বারা, এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যাকে N দ্বারা, সমষ্টিকে Σ (Sigma) দ্বারা সূচিত করলে,

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$ [Σ (Sigma) নম্বরসমূহের সমষ্টি]

কোনো পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য খুব বেশী না থাকলে, নিম্নোক্ত প্রণালীতে সহজ উপায়ে যৌগিক গড় নির্ণয় করা যায়।

প্রাপ্ত নম্বর দেখে মোটামুটি একটি গড় ধরে নিতে হবে। যে নম্বর বা যার কাছাকাছি নম্বর সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ছাত্র আছে এরূপ Mean-কে

কল্পিত গড় (Assumed Mean) বলা হয়। ঐ গড় থেকে প্রকৃত নম্বরের প্রত্যেকটির অন্তর নির্ণয় করতে হবে। কল্পিত গড়ের বেশীগুলিকে + যোগ চিহ্ন এবং কমগুলিকে − বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত করে স্থাপন করতে হবে। পরে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অন্তরগুলির বৈজিক সমষ্টি নির্ণয় করা দরকার।

এই বৈজিক সমষ্টিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাক। এই ভাগফল ও কল্পিত গড়ের বৈজিক সমষ্টিই নির্ণেয় যৌগিক গড় হবে।

উদাহরণ। A, B, C, D ইত্যাদি 15টি পরীক্ষার্থীর 300 নম্বরের ইংরাজী পরীক্ষার নম্বর দেওয়া হল। যৌগিক গড় নির্ণয় করতে হবে।

পরীক্ষার্থী	প্রাপ্ত নম্বর	Assumed Mean	অন্তর +	অন্তর −
A	155	150	5	
B	162	150 ...	... 12	
C	137	150 ...	... ...	... 13
D	153	150 ...	... 3	
E	146	150 ...	... ...	... 4
F	161	150 ...	... 11	
G	148	150 ...	... ...	... 2
H	137	150 ...	... ...	... 13
I	151	150 ...	... 1	
J	149	150 ...	... ...	... 1
K	154	150 ...	... 4	
L	153	150 ...	... 3	
M	146	150 ...	... ...	... 4
N	135	150 ...	... ...	... 15
O	157	150 ...	... 7	
15			+46	−52
			−6	

∴ যৌগিক গড় (Mean) $= 150 + \frac{-6}{15} = 150 + \frac{-2}{5} = 149\frac{3}{5}$

Mean = M, Assumed Mean = A, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অন্তরের যৌগিক সমষ্টি = ΣD এবং তথ্য সংখ্যা (এস্থলে ছাত্র সংখ্যা) N ধরে উক্ত নিয়মটি সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায়, $M = A + \frac{\Sigma D}{N}$.

উদাহরণ। নীচে ৫০টি ছাত্রের কোনো পরীক্ষার মোট নম্বর দেওয়া আছে। উহাদিগকে শ্রেণীর বিভাগ ৫ ধরে প্রত্যেক বিভাগের পরিসংখ্যান এবং যৌগিক গড় নির্ণয় করতে হবে।

485 466 476 445 466 471 477 464 471 474
447 478 476 452 470 458 471 467 480 478
473 448 468 457 481 472 465 469 473 484
475 456 458 487 456 472 462 493 473 483
497 481 487 561 453 472 462 479 488 479

শ্রেণী বিভাগ অন্তর	পরিসংখ্যান (+)	মধ্যবিন্দু (M.P.)	শ্রেণী অন্তরের দূরত্ব (x')	পরিসংখ্যান শ্রেণী অন্তর (fx')
495-499	1	497	5	5
490-494	2	492	4	8
485-489	4	487	3	12
480-484	5	482	2	10
475-479	8	477	1	8
				+43
470-474	10	472	0	
465-469	6	467	−1	− 6
460-464	4	462	−2	− 8
455-459	4	457	−3	−12
450-454	2	452	−4	− 8
445-449	3	447	−5	−15
440-444	1	442	−6	− 6
	N = 50			−55

যে ঘরে পরিসংখ্যান সর্বোচ্চ সেই ঘরের মধ্যবিন্দুকে কল্পিত মধ্যক (Assumed Mean or A. M.) ধরে নিতে হবে। এস্থলে ৪৭২ এর ঘরে সর্বোচ্চ

পরিসংখ্যান। মধ্যবিন্দু থেকে অন্তরগুলি শ্রেণী অন্তর (Step interval) হিসাবে গণনা করতে হবে। প্রথমতঃ ^{1}, ^{2}, ^{3} ইত্যাদি এবং ^{472} অপেক্ষা নিম্নতর সংখ্যাটিকে $^{-1}$, $^{-2}$, $^{-3}$ ইত্যাদি লিখে নিতে হবে। মধ্যবিন্দুর ঘরে ^{0} বসবে। এখন প্রত্যেক ঘরের পরিসংখ্যান দ্বারা অনুরূপ সংখ্যাটিকে চিহ্ন সমেত গুণ করা দরকার। যেমন ^{477} এর ঘরে $^{8\times1}=8$ বসান হয়েছে ; ^{463} এর ঘরে $4\times(-2)=-8$ বসান হয়েছে এস্থলে শুদ্ধিমান (Correction)

$$=C=\frac{+43-55}{50}=\frac{-12}{50}=-\cdot24.$$

নম্বর হিসাবে (sum interval) শুদ্ধি $=ci=-\cdot24\times5=-1\cdot2.$

$\therefore$ প্রকৃত মধ্যক $=472+(-1\cdot20)=470\cdot80.$

দ্রষ্টব্য ঃ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পরিসংখ্যান শ্রেণী অন্তর (fx') সমান হলে কল্পিত মধ্যকই প্রকৃত মধ্যক হবে।

শ্রেণী অন্তরের মধ্যবিন্দু (Mid point of a step interval)

কোনো শ্রেণী অন্তরের সর্বনিম্ন সীমার সঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার অন্তরের অর্ধযোগ করলেই শ্রেণী অন্তরের মধ্যবিন্দু পাওয়া যায়।

440, 441, 442, 443, 444, এর অর্থাৎ 440 – 444 এর মধ্যবিন্দু $=440+\frac{444-440}{2}=440+2=442.$

464 – 469 এই শ্রেণী অন্তরের মধ্যবিন্দু $=464\cdot5+\frac{469\cdot5-464\cdot5}{2}$

$=464\cdot5+2\cdot5=467$

উক্ত প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত আকার নিম্নে প্রদত্ত হল :

১। প্রথমতঃ রাশিতথ্যগুলিকে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা।

২। আপাততঃ একটি মধ্যক ধরে নেওয়া। সাধারণতঃ যে শ্রেণী অন্তরে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিসংখ্যান থাকে তার মধ্যবিন্দুকে কল্পিত মধ্যক (assumed mean) হিসাবে ধরে নেওয়া।

৩। কল্পিত মধ্যক থেকে প্রত্যেকশ্রেণীর মধ্যবিন্দুর পার্থক্য শ্রেণী একক হিসাবে স্থির করা।

৪। প্রত্যেক অন্তরকে পরিসংখ্যান দ্বারা গুণ করা (fx')।

৫। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক fx' গুণফলগুলির বৈজিক সমষ্টি নির্ণয় করা। ঐ সমষ্টিকে তথ্যসংখ্যা (N) দ্বারা ভাগ করা। ভাগফলকে শ্রেণীশুদ্ধক (C) বলা যেতে পারে।

৬। C-কে শ্রেণী অন্তর (Interval length) বা i দ্বারা গুণ করা। গুণফল Ci হল score correction।

৭। কল্পিত মধ্যকের সহিত Ci-এর বৈজিক সমষ্টি হবে প্রকৃত মধ্যক। সংক্ষিপ্ত আকারে আরও দুইটি উদাহরণ দেখান হ'ল।

উদাহরণ। সারী অন্তর (Step interval) এবং পরিসংখ্যান দেওয়া আছে; মধ্যক নির্ণয় করতে হবে।

সারী অন্তর (i)	পরিসংখ্যান (f)	মধ্যবিন্দু (M. P.)	x'	fx'
190-194	2	192	5	10
185.189	2	187	4	8
180-184	4	182	3	12
175-179	8	177	2	16
170-174	6	172	1	6
165-169	11	167	0	+52
160-164	9	162	−1	− 9
155-159	7	157	−2	−14
150-154	5	152	−3	−15
145-149	0	147	−4	0
140-144	2	142	−5	−10
	N = 56			−48

এস্থলে

$C = \frac{52-48}{56} = \frac{4}{56} = \frac{1}{14}$

$Ci = \frac{1}{14} \times 5 = \frac{5}{14}$

Mean (মধ্যক)

$= 167 + \frac{5}{14}$

$= 167{\cdot}35$

দ্রষ্টব্য। এস্থলে 167 এর ঘরে সর্বোচ্চ পরিসংখ্যান সুতরাং 167কে কল্পিত মধ্যবিন্দু (A. M) ধরা হয়েছে।

Mode :—কোন তথ্যমালায় যে সংখ্যাটি সর্বাপেক্ষা বেশীবার থাকে তাকে Mode বলা হয়। যেমন দশটি বালকের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় দশ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরগুলি যথাক্রমে, 4, 5, 7, 4, 6, 5, 8, 3, 2, 4। এস্থলে 4 নম্বরটি সর্বাপেক্ষা বেশীবার আছে। এইজন্য 4ই উক্ত নম্বরগুলির Mode।

মধ্যম-মান (median) :—সংখ্যাগুলিকে মানের ক্রম অনুসারে সাজানোর পর যে সংখ্যার উভয় দিকে সমান সংখ্যা থাকে তাকে median বলে। যেমন—

$$\left.\begin{matrix}1\\2\\3\\3\end{matrix}\right\}\text{ 4টি}$$

4 (median)

$$\left.\begin{matrix}5\\7\\7\\8\end{matrix}\right\}\text{ 4টি}$$

এস্থলে 4 এর উপরে 4টি সংখ্যা এবং নীচেও 4টি সংখ্যা ; সুতরাং উক্ত 9টি সংখ্যার median 4. অবশ্য উপরে ও নীচে 4টি সংখ্যার সমষ্টিগত মান সমান নয়।

যুগল সংখ্যাকালে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলিকে মানের ক্রম অনুসারে সাজালে মধ্যবর্তী দুইটী সংখ্যার পাটীগণিতীয় মধ্যকই উক্ত সংখ্যাসমূহের median হবে।

$$\left.\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}3\\4\end{matrix}\right] = 7$$

$$\left.\begin{matrix}5\\7\\8\end{matrix}\right\}$$

এস্থলে প্রাপ্ত মানসংখ্যা 8 সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যাটি মধ্যবর্তী দুইটি সংখ্যা।

$3+4=7$ এর পাটীগণিতীয় মধ্যক $7 \div 2 = 3{\cdot}5$

সুতরাং এস্থলে নির্ণেয় median $= 3{\cdot}5$

একটি উদাহরণ সাহায্যে প্রণালীটি প্রদর্শিত হল :—

সারী অন্তর			পরিসংখ্যান	
20-25	....	...	17	40
15-20	...	...	23	
10-15	...	...	29	
5-10	...	...	21	26
0- 5	...	...	5	
			N=95	

∴ নির্ণেয় মধ্যম-মান (median)

$$=10+\frac{47{\cdot}5-26}{29}\times 5$$

$$=10+3{\cdot}71=13{\cdot}71$$

প্রক্রিয়া :—

১। $\frac{n}{2}$ নির্ণয় করে এবং সর্বোচ্চ পরিসংখ্যানের ঘরে median আছে ধরে নেওয়া। এস্থলে 10 – 15এর ঘরে পরিসংখ্যান 29 সর্বোচ্চ এবং $\frac{n}{2}=\frac{95}{2}=47{\cdot}5$.

২। Median-এর ঘরের উপর বা নীচে পরিসংখ্যানের সমষ্টি নির্ণয় করা। এস্থলে নীচ হতে পরিসংখ্যানের সমষ্টি 26, $\frac{n}{2}$ থেকে (২নং নিয়মোক্ত পরিসংখ্যান সমষ্টি) বিয়োগ করা।

৩। উক্ত বিয়োগ-ফলকে medianএর ঘরের পরিসংখ্যান 29 দ্বারা ভাগ করা, এবং প্রাপ্ত ভাগফলকে শ্রেণী অন্তর সংখ্যা দ্বারা গুণ করা।

৪। উক্ত গুণফলকে median-এর ঘরের সর্বনিম্ন মানের (10) সহিত যুক্ত করা। এখন প্রাপ্ত যোগফলই নির্ণেয় median.

চতুর্থ অধ্যায়

বিচ্যুতি-মান

(Measures of Dispersion, Variability & Deviation)

পূর্ব অধ্যায়ে যে গড়-নির্ণয়-প্রণালী বর্ণিত হয়েছে তাতে বিশেষ বিশেষ অংশকের বহুলাংশের কোন না কোন নির্ণেয় বল-ধর্মের প্রবণতার একটা মোটামুটি মান পাওয়া যায়। এই গড়-মান থেকে প্রত্যেক মানের পার্থক্য বা বিচ্যুতি নির্ণয় করার জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

(1) প্রসার (Range).

(2) চতুর্থক পার্থক্য (Quartile Deviation).

(3) গড় পার্থক্য (Mean Deviation).

(3) সমক পার্থক্য (Standard Deviation).

প্রসার—সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নমানের অন্তরকে প্রসার বলা হয়।

চতুর্থক পার্থক্য—কতিপয় রাশির মধ্যমমান (median) তাদের দুটি ভাগে বিভক্ত করে। আবার প্রত্যেক অর্ধেককে একটা পূর্ণ অংশক মান করে প্রত্যেকের মধ্যম-মান নির্ণয় করলে, উচ্চতর অংশের মধ্যম-মানকে গুরু চতুর্থক (Upper Quartile) এবং নিম্নতর অংশের মধ্যম-মানকে লঘু চতুর্থক (Lower Quartile) বলা হয়। গুরু ও লঘু চতুর্থকদ্বয়ের অন্তরকে 2 দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হয় তাকে অংশকের চতুর্থক-পার্থক্য (Quartile Deviation) বা সংক্ষেপে (Q. D.) বলা হয়।

উদাহরণ। বাংলা পরীক্ষায় 16টি বালকের নম্বর মানের শতকরা ক্রম অনুসারে সাজানো আছে। প্রসার এবং চতুর্থক পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

নম্বর (%)

196
194
193
190, 188 } 189 (গুরু চতূর্থক)
187
186
184, 183 } 183.5 (মধ্যম মান)
181
180
178, 176 } 177 (লঘু-চতুর্থক)
175
174
172

16

এস্থলে :

(1) প্রসার (Range) $= 196 - 172 = 24$

(2) চতুর্থক পার্থক্য (Q. D.) $= \frac{189 - 177}{2} = 6$

গড়-পার্থক্য (Mean Deviation)

গড়-পার্থক্য—কোন রাশিমালায় মধ্যগামী মানের যে কোন একটি থেকে (সাধারণতঃ মধ্যম-মান থেকে) প্রত্যেক মানের বিচ্যুতি বা পার্থক্যের পাটীগণিতিক গড়কে গড়-পার্থক্য বলে। এখানে সমস্ত পার্থক্যগুলিকে ধনাত্মক কল্পনা করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ। (সরল রাশিমালা)

নম্বর (%)		মধ্যমান থেকে পার্থক্য (deviation)
190	...	9
189	...	8
188	...	7
187	...	6
186	...	5
184	...	3
182	...	1
181	...	0
180	...	1
178	...	3
177	...	4
176	...	5
175	...	6
173	...	8
172	...	9
N = 15		75(Σd)

এস্থলের রাশিমালার মধ্যম-মান = 181
রাশি সংখ্যা = 15
পার্থক্য-সমষ্টি = 75

∴ গড় পার্থক্য $= \frac{75}{15} = 5$

সূত্রাকারে – $\text{M. D.} = \frac{\Sigma d}{\text{N}}$.

উদাহরণ। (শ্রেণী-বিন্যাস ক্ষেত্রে)

শ্রেণী-অন্তর		মধ্য-বিন্দু		পরিসংখ্যান (f)		মধ্যমা মান থেকে (d) মধ্যবিন্দুর পার্থক্য		$f \times d$,
195-200	...	197·5	...	22	...	13·12	...	288·63
190-195	...	192·5	...	68	...	8·12	...	552·16
185-190	...	187·5	...	51	...	3·12	...	150·12
✓180-185	...	182·5	...	28	...	1·88	...	52·64
175-180	...	177·5	...	47	...	6·88	...	325·36
170-175	...	172·5	...	33	...	11·88	...	391·04
165-170	...	167·5	...	21	...	16·88	...	354·48
160-165	...	162·5	...	9	120	21·88	...	196·92
155-160	...	157·5	...	6	...	26·78	...	161·28
150-155	...	152·5	...	2	...	31·88	...	63·76
145-150	...	147·5	...	1	...	36·88	...	36·88
140-145	...	142·5	...	1	...	41·88	...	41·88
				289				2615·16

এস্থলে মধ্যম-মান $= 180 + \frac{\frac{289}{2} - 120}{28} \times 5 = 180 + \frac{24.5}{28} \times 5$

$= 180 + 4.38 = 184.38$

$\therefore$ গড় পার্থক্য $= \frac{2615.16}{289} = 6.08$

সূত্রাকারে $-$ M. D. $= \frac{\Sigma fd}{N}$

গড় পার্থক্য নির্ণয়ের সহজতর প্রণালী :—

১। প্রকৃত মধ্যম-মান নির্ণয় করা।

২। প্রত্যেক শ্রেণী অন্তর পরিসংখ্যান (f) নির্ণয় করা।

৩। শ্রেণী অন্তরের যে সারিতে প্রকৃত মধ্যম মান আছে তার মধ্য বিন্দুকে কল্পিত মধ্যম-মান (assumed mean) ধরে নেওয়া।

৪। উক্ত উভয় মধ্যম-মানের অন্তরকে শ্রেণী অন্তর দ্বারা ভাগ করা ও ভাগফল-শুদ্ধি করা।

৫। কল্পিত মধ্যম-মান থেকে যে সমস্ত পরিসংখ্যান অধিক এবং অল্প তাদের অন্তর নির্ণয় করা। (যেমন $148 - 141$)

৬। উক্ত অন্তরকে পূর্বোক্ত শুদ্ধিমান দ্বারা গুণ করলে সেই শুদ্ধিমান পাওয়া যাবে।

৭। শ্রেণী অন্তর হিসাবে কল্পিত মধ্যক থেকে দূরত্ব (d) নির্ণয় করা।

৮। fxd নির্ণয় করা।

৯। Σfd নির্ণয় [Σ (Sigma) এর দ্বারা সমষ্টি সূচিত হয়।

১০। ($\Sigma fd +$ পূর্ণশুদ্ধ) কে শ্রেণী অন্তর দ্বারা গুণ করা এবং প্রাপ্ত গুণফলকে সমগ্র পরিসংখ্যান দ্বারা ভাগ করা। ভাগফলই নির্ণেয় গড়-পার্থক্য।

সমক-পার্থক্য (Standard Deviation)

সমক-পার্থক্য গড়-পার্থক্য (mean deviation) নির্ণয়ে মধ্যম মান থেকে বিচ্যুতি-মানসমূহকে ধনাত্মক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

সমস্ত বিচ্যুতিমান ধনাত্মক নয়। গড় থেকে পার্থক্যগুলির বর্গসমূহের পাটীগণিতিক গড়ের বর্গমূল নিলে যে সংখ্যা উৎপন্ন হবে তাকে সমক-পার্থক্য বলা হয়।

সমক-পার্থক্যকে উক্ত সংজ্ঞানুসারে মূল-গড়-বর্গ পার্থক্য (Root-mean-Square-Deviation) বলা হয়।

সমক-পার্থক্যকে সংক্ষেপে "S. D." দ্বারা সূচিত করা হয়। S. D.-কে গ্রীক অক্ষর σ (Sigma) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ সাহায্যে S. D. নির্ণয়-প্রণালী দেখানো হল।

উদাহরণ (সরল শ্রেণী)।

প্রাপ্ত নম্বর	গড় বিচ্যুতি	d^2
10	5	25
8	3	9
7	2	4
4	—1	1
3	—2	4
2	—3	9
1	—4	16
N = 7		$\Sigma d^2 = 68$

এস্থলে, গড়

$$= \frac{(10+8+7+4+3+2+1)}{7}$$

$$= \frac{35}{7} = 5$$

$$\therefore \quad \text{S. D. } (\sigma) = \sqrt{\tfrac{68}{7}} = \sqrt{9{\cdot}71}$$

সূত্রাকারে $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d^2}{N}}$

উদাহরণ (পরিসংখ্যান শ্রেণীতে)।

প্রাপ্ত নম্বর	পরিসংখ্যান (f)	d	fd	fd^2
1	1	—5	—5	25
2	2	—4	—8	32
3	2	—3	—6	18
4	1	—2	—2	4
5	4	—1	—4	4
6	6	0	0	0
7	3	1	3	3
8	3	2	6	12
9	2	3	6	18
10	1	4	4	16
11	1	5	5	25
	N = 26			$\Sigma fd^2 = 157$

এস্থলে গড় = 6 (স্থূলতঃ)

$$N = 26$$

$$\therefore \quad \text{S. D.} = \sqrt{\tfrac{157}{26}} = \sqrt{6{\cdot}03}$$

$$= 2{\cdot}35$$

সূত্রাকারে

$$\text{S. D.} = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$$

উদাহরণ। (শ্রেণী অন্তর ও পরিসংখ্যান যুক্ত)।

শ্রেণী অন্তর (i)	f	d	fd		fd^2
195-199	1	5	5	+43	25
190-194	2	4	8		32
185-189	4	3	12		36
180-184	5	2	10		20
175-179	8	1	8		8
170-174	10	0	0		
165-169	6	−1	−6	−55	6
160-164	4	−2	−8		16
155-159	4	−3	−12		36
150-154	2	−4	−8		32
145-149	3	−5	−15		75
140-144	1	−6	−6		36
	N = 50				$\Sigma fd^2 = 322$

শুদ্ধিমান (Correction) $= \frac{+43-55}{50} = \frac{-12}{50} = -\cdot24$

$\therefore \quad C^2 = (-\cdot24)^2 = \cdot0575$

$$S.\ D. = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N} - C^2} \times i \text{ (শ্রেণী অন্তর)}$$

$$= \sqrt{(\tfrac{322}{50} - \cdot0575)} \times 5$$

$$= \sqrt{6\cdot3824} \times 5$$

$$= 2\cdot526 \times 5$$

$$= 12\cdot630$$

সমক পার্থক্য নির্ণয়ের নিয়ম :—

১। পরিসংখ্যান সমষ্টি (N) নির্ণয় করা।

২। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যানের ঘরে (এস্থলে 170 − 174) গড় কল্পনা করে নেওয়া।

৩। উক্ত গড় থেকে শ্রেণী হিসাবে দূরত্ব (d) নির্ণয় করা।

৪। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক fd নির্ণয় করা।

৫। fd কে পুনরায় (d) দ্বারা গুণ করে Σfd^2 এবং fd^2 নির্ণয় করা।

৬। শুদ্ধিমান (C) ও C^2 নির্ণয় করা।

এখন $\left(\frac{\Sigma fd^2}{N} - C^2\right)$ এর বর্গমূলকে শ্রেণী অন্তর (i) এস্থলে 5 দ্বারা গুণ করা। লব্ধ গুণফলই নির্ণেয় সমক পার্থক্য (S. D.)

পরিশিষ্ট

গবেষণামূলক পরীক্ষা

বহু মনস্তাত্ত্বিক অভিনিবেশ, স্মৃতি, আবেগ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণার সাফল্যের মূলে আছে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারই কিছু নমুনা দেবার প্রয়োজন আছে—কারণ শিক্ষার্থীরাও সেই পথে কিছু কিছু পরীক্ষা করতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক মনোযোগ বা অভিনিবেশ নিয়ে কি কি পরীক্ষা করা চলে। আগেই বলা হ'য়েছে যে উত্তেজকের ওপরও মনোযোগ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আবার ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্যেও অভিনিবেশের তারতম্য দেখা যেতে পারে।

(১) স্মৃতি (Memory)

সাধারণতঃ স্মৃতিশক্তি দুইভাবে পরীক্ষা করা যায়। প্রথমে দেখা যেতে পারে যার ওপর পরীক্ষা করা হবে সে একসঙ্গে কতগুলো জিনিস মনে রাখতে পারে। এই ধরনের স্মৃতি-শক্তিকে বলা হয় Immediate Span of Memory. দ্বিতীয়তঃ Subject-এর মুখস্থ-ক্ষমতা কতখানি তাও পরিমাপ করা চলে।

এইবার দেখা যাক Memory span কিভাবে মাপা যায়। প্রথমে ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে তিনটি list করা যায়। প্রতি list-এ একটা করে বাড়িয়ে ৩টা সংখ্যা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত কয়েকটা সারি করতে হবে। এইবার subjectকে বেশ আরাম করে তোমার সামনে বসানো দরকার। তারপর একটা লিস্ট নিয়ে প্রথম সারি থেকে বলে যান। এক-একটা সারি বলা হওয়া মাত্র subjectকে সেগুলো আবৃত্তি করতে বলবেন। পর পর দুইবার ভুল করলে

পরীক্ষা বন্ধ করবেন। এইভাবে বাকি দুইটি লিস্ট দিবেন। যেখানে সে দুইবার ভুল করবে সেখানে থামতে হবে। এইবার দেখতে হবে প্রথম লিস্টএ সে কটা পেরেছে, দ্বিতীয় লিস্টএ কটা এবং তৃতীয় লিস্টএ কটা। এইবার এই তিনটির গড় নিলে তার Memory span পাওয়া যাবে। ধরা যাক, প্রথমে সে ৫টা পেরেছে, পরে ৬টা এবং তারপরে ৬টা ; কাজেই তার Memory span হবে ৫+৬+৬÷৩ বা ৫$\frac{২}{৩}$।

এখন বিভিন্ন সংখ্যাবিশিষ্ট এই সারিগুলি করার দুটো নিয়ম আছে। (১) দেখতে হবে একই সারির প্রথম ও শেষ সংখ্যা যেন এক না হয় ; (২) প্রথম সারির প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সারির শেষ সংখ্যা বা প্রথম সারির শেষ সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সারির প্রথম সংখ্যা যেন এক না হয়।

এই পরীক্ষা আবার দুই ভাবে করা চলে। Test materialগুলো Subjectকে পড়ে শোনানো যেতে পারে বা একটা কাগজ ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে একটা একটা করে দেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় দুইএর সাহায্যেই Memcry span মাপা চলে।

এইবার দেখা যাক বা মুখস্থক্ষমতা কি ভাবে পরীক্ষা করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে Ebbinghaus নামে এক ভদ্রলোক Non-sense syllable বা অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করেন। দুইটি consonant ও তার মাঝে একটি vowel দিয়ে এই Nonsense syllable তৈয়ারী করা হয়। মনে রাখতে হবে এই syllableগুলি যেন অর্থহীন হয়। যেমন, GOS, BEN, SUD প্রভৃতি।

পরীক্ষা পদ্ধতি—প্রথমে ১২টি Nonsense syllableবিশিষ্ট তিনটি লিস্ট তৈয়ারী করা। এটি তৈয়ারী করার সময় কয়েকটি নিয়ম মনে রাখতে হবে, (১) কোন syllable যেন অর্থবোধক না হয়। (২) পর পর দুইটি syllableএ যেন একই vowel ব্যবহৃত না হয়। (৩) কোন syllableএর দুইটি অক্ষর যেন একই listএ অন্য syllableএ না ব্যবহৃত হয়। (৪) প্রথম

syllableএর প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় syllableএর শেষ অক্ষর যেন এক না হয়।

এইবার Subjectকে বেশ আরাম করে বসতে বলুন। এখন list নিয়ে একটি একটি করে ১২টি syllable তাকে বলে যেতে হবে। যতক্ষণ সে পুরা listটি মুখস্থ করে যেমন পর পর syllableগুলো আছে তেমন করে আবৃত্তি করতে না পারে ততক্ষণ বলে যেতে হবে। এইভাবে বাকি list দুইটি তাকে মুখস্থ করানো দরকার। দেখতে হবে তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় list মুখস্থ করতে কতবার করে reading লেগেছে। ধরা যাক, প্রথমবার ৮ বার, দ্বিতীয়বার ৭ বার এবং তৃতীয়বারেও ৮ বার। এখন এই তিনটির গড় বা ৭$\frac{২}{৩}$ হবে তাহার মুখস্থ করার সময়।

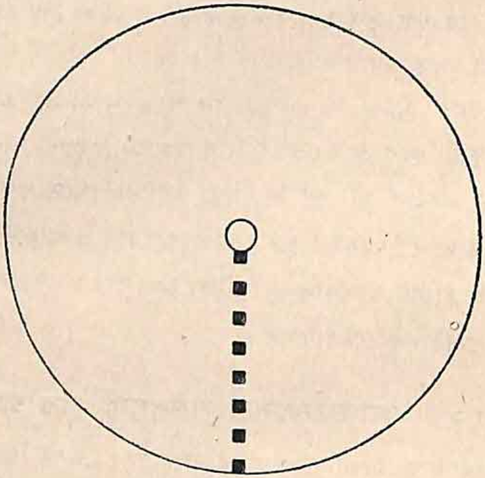
এখানেও list material subjectকে পড়ে শোনানো যেতে পারে অথবা একটি কাগজ ফুটো করে তার ভেতর দিয়ে দেখানো যেতে পারে। এইভাবে চোখ বা কান দুইএর সাহায্যে-ই মুখস্থ করানো যেতে পারে। গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, কেউ শুনে কেউ বা দেখে ভাল মনে রাখতে পারে। এইজন্য এই দুই ভাবেই স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করা যায়। তাহলে স্মৃতি-শক্তির পরীক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি বোঝা গেল।

(২) অভিনিবেশ সম্পর্কে পরীক্ষা

এইবার দেখা যাক অভিনিবেশ বা মনোযোগের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরীক্ষা করা যেতে পারে। অভিনিবেশ বা মনোযোগের ক্ষেত্রেও দুইভাবে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। প্রথমে fluctuations of attention বা কোন একটি জিনিসের প্রতি subject কতক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে সেটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, span of attention বা subject একসঙ্গে কতগুলো জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে।

প্রথমে fluctuation of attentionএর পরীক্ষা সম্বন্ধে বলব। এই উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় তার নাম Masson's Disc Apparatus. এই

Masson's Disc হচ্ছে একটা সাদা রং-এর গোল চাক্তি। এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটা লাইনের মত করে কতগুলো কালো বিন্দু পর পর বসিয়ে চাক্তির ধার পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। এখন এই সাদা চাক্তিটি একটি Electric wheelএর গায়ে আটকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এখন এই চাক্তিটি যখন ঘুরতে থাকে তখন তার ভেতরের বিন্দুগুলি পর পর কতগুলো গোলকের সৃষ্টি করে। এইবার subject-এর সামনে একটা Electrical key রেখে তাকে বেশ আরাম করে বসতে বলা হবে। Subjectকে বলা হবে, "তুমি বেশ মনোযোগ



সহকারে পরিধির নিকটতমবর্তী গোলকটির দিকে তাকাও, যখন দেখবে গোলকটি আর দেখা যাচ্ছে না তখন keyটা টিপে ধরে থাকবে এবং যখন দেখা যাবে তখন ছেড়ে দেবে।" এখন এই Electrical keyর সঙ্গে একটা Stylus এমন ভাবে সংযুক্ত আছে যে keyটি টেপা এবং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে Stylusটি একটা smoked drumএর ওপর দাগ কেটে যাবে। এখন এই দাগগুলো একটা time-workerএর সাহায্যে মাপলে fluctuationএর

সময়টা পাওয়া যাবে। Smoked drumএর উপরে দাগ দেখতে পাওয়া যাবে।

সাধারণতঃ ৪ বা ৫ সে. এর মধ্যে fluctuation ঘটে ; কিন্তু ভাল অভ্যাস থাকলে ২৪ বা ২৫ সে পর্যন্ত মনোযোগ স্থায়ী হয়, আরও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে।

এইবার দেখা যাক Span of attentionএর পরীক্ষা কিভাবে করা যায়। এখন Span of attention বলতে আমরা বুঝি, যে subject একসঙ্গে কতগুলো দ্রব্যের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। এখন এটা যে যন্ত্র দিয়ে মাপা হয় তার নাম Tachistoscope। Tachistoscope দিয়ে কোন দ্রব্য, ছবি বা সংখ্যা subjectকে একবার খুব অল্প সময়ের জন্য দেখানো হয় যাতে subject তার দৃষ্টি বিভিন্ন দ্রব্যের ছবির দিকে ঘুরোতে না পারে। এই যন্ত্রটি Cattel নামক এক ভদ্রলোক আমেরিকাতে প্রথম Span of attention মাপার জন্য ব্যবহার করেন।

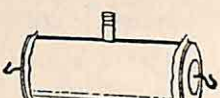
এখন subjectকে ভালভাবে বসিয়ে Tachistoscopeএর সাহায্যে কতগুলি অক্ষর বা ছবি একসঙ্গে দেখানো হয়। তারপর তার কটা মনে আছে সেটা বলতে বলা হয়। এইভাবে সে যে-কটা অক্ষর বা ছবি মনে রাখতে পারে তা দিয়ে তার Span of attention মাপা হয়। এই Tachistoscope আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়।

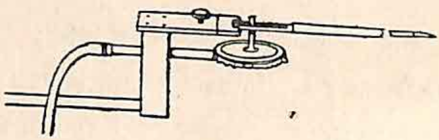
(৩) কায়িক পরিবর্ত্তন (Bodily changes)

বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় এবং অনুভূতিতে আমাদের শারীরিক কতগুলি পরিবর্ত্তন ঘটে। এইসব পরিবর্তন বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। Peneumograph নামক যন্ত্রদ্বারা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাপ করা যায়। এই Peneumographএর কয়েকটি অংশ আছে। প্রথমে একটা ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার ফাঁপা মোটা নল আছে—এর দুদিক পাতলা রবারের পর্দা দিয়ে

ঢাকা। এই পর্দা দুটির ঠিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে দুটো দড়ি ঝুলান আছে। এখন এই দড়ি দিয়ে ড্রামটি subjectএর বুকের ঠিক তলাতে বেশ শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এইবার subjectএর শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ড্রামের ভেতরে একটা চাপ সৃষ্টি হয়। এখন ড্রামের ভেতরকার এই চাপ একটা রবারের টিউবের সাহায্যে Tambour নামক অংশের ভেতর চালিত করা হয়, যেটা আবার একটা Stylusএর সাহায্যে সেই চাপ একটা smoked drumএর ওপর এসে যাবে।

এখন যেহেতু মনের বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটে সেজন্য subjectকে আনন্দব্যঞ্জক বা দুঃখব্যঞ্জক অনুভূতি দিয়েও এই ধরনের Peneumographic record নেওয়া হয়। Peneumograph ছাড়াও Plethysmograph, Sphygmograph, Automatograph প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনের মাপ করা যায়।





আমাদের শারীরিক ক্লান্তি কি ভাবে আসে তার একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় Ergograph নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রশ্নাবলীর সাহায্যে
ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা
(অধ্যবসায় পরীক্ষা)

[পরিষ্কার করে লিখে দাও]

নাম…………………………………বয়স…………………

শ্রেণী………………বিদ্যালয়…………………………………

নির্দেশ ঃ—সব কয়টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও। প্রশ্নগুলির উত্তর জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই দিতে হবে। ভুল, ঠিক, ভাল, মন্দ, বলে কোনও উত্তর নেই, কারণ উত্তরগুলির বিচার কোন ঠিক, ভুল, সত্য, মিথ্যার মাপ-কাঠিতে করা হবে না। পরীক্ষার এমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। সত্যিকারের তোমার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা, সেই ধারণা অনুযায়ী সততার সঙ্গে সত্যকথা বলতে পার কি না পার, তাই দেখা হবে। নীচে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে পাশে হ্যাঁ, না ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে। যেখানে প্রশ্নের কোনও নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিতে পার না অর্থাৎ যেখানে সন্দেহ আছে, সেখানে কেবল জিজ্ঞাসার চিহ্নের নীচে দাগ দেবে। কোন প্রশ্ন ছাড়বে না।

১। যে কাজ করতে অনেক সময় লাগে সে সব কাজ তুমি পছন্দ কর কি না? — হ্যাঁ ? না

২। তুমি যখন কাজ কর তখন তুমি কি কাজের মধ্যে এমনি ভাবে ডুবে থাক যে আশেপাশে যা ঘটছে তার দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না? — হ্যাঁ ? না

৩। তুমি যখন খেলা কর তখন কি সে খেলায় কৃতিত্ব না দেখান পর্যন্ত তাতে লেগে থাক? — হ্যাঁ ? না

৪। কোন কাজে বিফলতা কি তোমাকে নূতন উদ্যম এনে দেয়? — হ্যাঁ ? না

৫। অনিল কাজ করতে করতে যদি কাজটাকে কঠিন মনে করে তবে সে কাজ না করে অন্য কাজে চলে যায়; সে কি তোমার মত? — হ্যাঁ ? না

৬। কোন কাজকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে তোমার কি খুব কষ্ট হয়? হ্যাঁ ? না

৭। অরুণ জানে যে তার যে বিষয়ে ধারণা ভাল, অন্য লোক তার ধারণাকে আঘাত করে উল্টো কথা বললেও সে মত পাল্টাতে নারাজ। তুমি কি তার মত? হ্যাঁ ? না

৮। কোন কাজ একঘেয়ে ও নীরস লাগলেও তাতে লেগে থাকবার সঙ্কল্প নাও কি না? হ্যাঁ ? না

৯। তোমার বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক ও অভিভাবক কি অনেক সময় তোমাকে একগুঁয়ে বলে থাকেন? হ্যাঁ ? না

১০। কোন কাজ স্বরু করার পর যদি কোন নূতন কাজ মাঝখানে এসে পড়ে, তবে তুমি কি স্বরু-করা কাজ ছেড়ে দিয়ে নূতন কাজে লেগে পড়? হ্যাঁ ? না

১১। যখন কোন জীবন-সমস্যা তোমার সামনে আসে তখন তুমি কি সঙ্কল্প নিয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা কর? হ্যাঁ ? না

১২। যে কাজ শেষ করতে হয়ত তোমার কয়েকটা বছর লেগে যাবে সে কাজ কি তোমার খারাপ লাগে? হ্যাঁ ? না

১৩। অপরের উৎসাহ উদ্দীপনা ছাড়াও কি তুমি কোন ক্লান্তিকর কাজে অনেকক্ষণ লেগে থাকতে পার? হ্যাঁ ? না

১৪। মনের ভাল লাগা না লাগার ব্যাপারটা কি তোমার খুব তাড়াতাড়ি বদলে যায়? হ্যাঁ ? না

১৫। যখন যে কাজ ধর তখন সে কাজ শেষ না করে তুমি কি সহজে অন্য কাজে হাত দাও? হ্যাঁ ? না

১৬। তুমি কি অনেক কাজ একসঙ্গে না ধরে এক-এক করে প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ কর? হ্যাঁ ? না

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (১)

যে প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে তোমার পছন্দ অপছন্দ যাচাই করা যাবে যদি তুমি খোলা মনে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর। কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় কেবল তোমার নিজের যা ভাল লাগে বা না লাগে, বা নিজে যা কর না কর সেই কথাই ভাববে—আর সেইমত উত্তর দিয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে হ্যাঁ, না ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন (?) দেওয়া রয়েছে।

এখন নীচের প্রশ্নগুলি বুঝে উত্তর দিয়ে যাও অর্থাৎ হাঁ বা না এর চারিপাশে এইরূপ O চিহ্ন এঁকে দেবে। যদি কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে না পার, তখনই প্রশ্নসূচক চিহ্নের চারিপাশে এইরূপ O চিহ্ন এঁকে দেবে। সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিতে হবে, একটিও ছেড়ে দেবে না।

স্কুল থেকে আসার পর নীচের কয়েকটি কাজের মধ্যে তুমি সাধারণতঃ কি কর বা করতে চাও?

১। বাড়ী বসে ছবি আঁক? হ্যাঁ ? না

২। আবিষ্কারের গল্প পড়? হ্যাঁ ? না

৩। কোন ভাঙ্গা ঘড়ি নিয়ে সারাবার চেষ্টা কর? হ্যাঁ ? না

৪। বাড়ীর বাগানের কাজ কর? হ্যাঁ ? না

৫। বসে বসে কোন প্রবন্ধ লেখ? হ্যাঁ ? না

কোন ছুটীর দিনে তুমি কি করে সময় কাটাবে?

৬। বাড়ীর বাগানটিতে শাকসব্জী চাষ করতে চেষ্টা করবে? হ্যাঁ ? না

৭। ব্যাকরণের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে? হ্যাঁ ? না

৮। উপরের ঘরে গিয়ে কবিতা লিখবে? হ্যাঁ ? না

৯। কাগজের শেয়ারের বাজারের দর-দাম নিয়ে হিসাব করবে? হ্যাঁ ? না

১০। টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে সময় কাটাবে? হ্যাঁ ? না

১১। উদ্ভিদের জন্মকথা পড়বে? হ্যাঁ ? না

যদি কোন দিন ছুটী পাও তবে তুমি কি কি কাজ করে সেই দিনটির সদ্ব্যবহার করবে ?

১২। কোথাও কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি দেখতে যাবে ? হ্যাঁ ? না

১৩। কোন ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ লক্ষ্য করবে ? হ্যাঁ ? না

১৪। কাছাকাছি কোন ল্যাবরেটারীতে গিয়ে কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করবে ? হ্যাঁ ? না

হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে যদি দেখ যে গাড়ী ছাড়বার তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকী তখন তুমি কি করবে ?

১৫। গ্লোব নার্শারীর দোকানে গিয়ে বীজ বা গাছের খোঁজ খবর নেবে ? হ্যাঁ ? না

১৬। কোন দোকানে গিয়ে তাদের মাসিক আয়ব্যয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে ? হ্যাঁ ? না

১৭। প্লাটফর্ম্মের ভিতরে গিয়ে ইঞ্জিনের খুঁটিনাটির কথা জেনে নেবার চেষ্টা করবে ? হ্যাঁ ? না

১৮। কোনও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার পাতা উল্টাতে থাকবে ? হ্যাঁ ? না

বর্ষার দিনে যখন বাইরের কোন কাজ করা সম্ভব হয় না, তখন ঘরে বসে তুমি কি ধরনের কাজ করবে ?

১৯। ছবি দিয়ে ঘর সাজাবে ? হ্যাঁ ? না

২০। গাছের যে-সব বীজ সঞ্চয় করেছ তাদের বেছে ফেলবার চেষ্টা করবে ? হ্যাঁ ? না

২১। ঘরে বসে কোন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়বে ? হ্যাঁ ? না

২২। বসে বসে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী মন দিয়ে পড়বে ? হ্যাঁ ? না

স্কুলে গিয়ে মাষ্টার মশাই না আসার জন্য হঠাৎ যদি কিছুক্ষণের ছুটি পেয়ে যাও, তবে সে সময়টা কি ভাবে কাটাবে ?

২৩। স্কুলের লাইব্রেরীতে গিয়ে অঙ্কের সমস্যা নিয়ে সময় কাটাবে ? হ্যাঁ ? না

২৪। পূজার জন্য যে আয়ব্যয় হয়ে গেছে তার একটি হিসাব করে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিরূপণ করবে ? হ্যাঁ ? না

২৫। স্কুলের কোনও নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে কোন ছবি আঁকবার চেষ্টা করবে ? হ্যাঁ ? না

২৬। ল্যাবরেটারীর শিশিবোতল নিয়ে অ্যাসিড ঢালাঢালি করবে ? হ্যাঁ ? না

২৭। কোন পড়ে-থাকা জমিকে ঘিরে কোন ফুলের গাছ করার চেষ্টা করবে ? হ্যাঁ ? না

তোমার বেশীর ভাগ সময় কি করে কাটে ?

২৮। বাড়ীতে বসে টাইপ-পত্র করে ? হ্যাঁ ? না

২৯। বিজ্ঞানের বই পড়ে ? হ্যাঁ ? না

৩০। কোন কিছু এঁকে ? হ্যাঁ ? না

৩১। যন্ত্রপাতির কাজ করে ? হ্যাঁ ? না

৩২। ইতিহাস পড়ে ? হ্যাঁ ? না

৩৩। ফুল ফলের চাষ করে ? হ্যাঁ ? না

৩৪। তুমি কি মাঝে মাঝে কোন দোকানে গিয়ে তাদের ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির খোঁজ খবর নাও ? হ্যাঁ ? না

তোমার হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি তা দিয়ে কি কিনবে?

৩৫। ছবি? হ্যাঁ ? না

৩৬। যন্ত্রপাতি? হ্যাঁ ? না

৩৭। ফুলের বীজ? হ্যাঁ ? না

৩৮। কাব্যের বই? হ্যাঁ ? না

৩৯। বৈজ্ঞানিকদের জীবনী? হ্যাঁ ? না

৪০। হিসাবের জন্যে খাতা? হ্যাঁ ? না

৪১। তোমার বিদ্যালয়ের পত্রিকায় বা অন্য কোন পত্রিকায় তোমার কোন প্রবন্ধ বেরিয়েছে কি না? হ্যাঁ ? না

৪২। বাড়ীর বা স্কুলের বাগানে তুমি কি নিয়মিত কাজ কর? হ্যাঁ ? না

৪৩। কলকারখানা দেখতে তোমার খুব ভাল লাগে কি না? হ্যাঁ ? না

৪৪। বাড়ীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে তোমার ভাল লাগে কি? হ্যাঁ ? না

৪৫। তুমি কি অবসর সময়ে যন্ত্রপাতির কাজ করতে ভালবাস? হ্যাঁ ? না

৪৬। তোমার কি সাধারণতঃ শিল্পীদের জীবনী পড়তে ভালো লাগে? হ্যাঁ ? না

৪৭। কলা-প্রদর্শনীতে তুমি কি প্রায়ই যাও? হ্যাঁ ? না

৪৮। খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতির কাজ তোমার ভাল লাগে কি না? হ্যাঁ ? না

৪৯। তুমি কি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী সম্পর্কে জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহলী? হ্যাঁ ? না

৫০। খবরের কাগজের বা কোন পত্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, শেয়ার মার্কেটের পৃষ্ঠা মন দিয়ে পড় কি না? হ্যাঁ ? না

৫১। মালীদের কাজ তোমার ভাল লাগে কি না ? হ্যাঁ ? না

৫২। কোন অভিনয়ে কোন দিন কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছ কি না ? হ্যাঁ ? না

৫৩। অন্য কিছু লিখতে লিখতে খাতায় প্রায় হিজিবিজি আঁক কি না ? হ্যাঁ ? না

৫৪। কাদামাটি দিয়ে মডেল তৈয়ারীর কাজ তোমার ভাল লাগে কি না ? হ্যাঁ ? না

৫৫। অন্য বইয়ের তুলনায় তুমি বিজ্ঞানের বই বেশী পড়েছ কি না ? হ্যাঁ ? না

৫৬। সভ্যতার ইতিহাসের বই পড়তে তোমার ভালো লাগে কি ? হ্যাঁ ? না

৫৭। তুমি কি সাধারণ গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে তথ্যমূলক প্রবন্ধ পড়তে ভালবাস ? হ্যাঁ ? না

৫৮। তুমি কি প্রাণি-বিজ্ঞানের বিষয় বেশী জানতে চাও ? হ্যাঁ ? না

৫৯। তুমি কি কোন কিছু কলকব্জা দেখলে তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা কর ? হ্যাঁ ? না

৬০। দিনের বেশী ভাগ পড়ার সময় তুমি কি সমাজবিজ্ঞান বা ভূগোল পড়ে কাটাও ? হ্যাঁ ? না

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (২)

নির্দ্দেশ ঃ—তোমাদের কাছে অনেক রকমের অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে। সব প্রশ্নেরই উত্তর করবার চেষ্টা করবে। তবে উত্তর করবার আগে সব প্রশ্নগুলো একবার পড়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন **উত্তর**

১। কি কি সার কপি গাছের পক্ষে প্রয়োজন ?

২। চিত্রশিল্পে কে কে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ?

৩। যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাব-পত্রের স্ববিধার জন্য কি কি খাতা বা Registerএর একান্ত প্রয়োজন ?

৪। পদার্থ-বিজ্ঞানকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

৫। ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কে কি "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন ?

৬। গাছের গোড়া কোন্ সময়ে খুঁড়ে দেওয়া উচিত ?

৭। শিল্পী কোন্ প্রতিমার মুখে কোন্ বিশেষ অংশ সবচেয়ে শেষে যোজনা করে ?

৮। সাধারণতঃ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় কি ভাবে টাকাকড়ির আদান-প্রদান হয় ?

৯। আইনষ্টাইনের অবদান কি ?

১০। একটা ঘড়িতে সাধারণতঃ কটা wheel থাকে ?

১১। পিথাগোরাস কিসের জন্য বিখ্যাত ?

১২। পাট জন্মাবার জন্য কিরূপ জমি নির্ব্বাচন করা উচিত ?

১৩। চেক কি কি রকমের আছে ?

১৪। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোন্ আকারের জিনিস সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে ?

১৫। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—এটি কার উক্তি ?

প্রশ্ন	উত্তর
১৬। কোন্ কোন্ গাছ অল্প অন্ধকার জায়গায় ভাল জন্মায় ?	
১৭। পাশ্চাত্যের শিল্পীদের কাকে তোমার ভাল লাগে ?	
১৮। বাসের কোন্ চাকার সাথে ইঞ্জিনের যোগাযোগ থাকে ?	
১৯। আর্ট কত রকম আছে ?	
২০। অডিটারদের সাধারণতঃ কি কাজ ?	
২১। বেতারে যে গান আমরা শুনি তা কিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছায় ?	
২২। একটা টর্চলাইট-এর ব্যাটারীতে কত ভোল্টের কোন্ Cell থাকে ?	
২৩। একই জমিতে বছরে সবচেয়ে বেশী কতবার ধান চাষ করা যায় ?	
২৪। "লিমিটেড ফার্ম" কি কি রকমের ?	
২৫। এটমের উপাদান কি কি ?	
২৬। দক্ষিণ ভারত কোন্ কোন্ কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত ?	
২৭। রেলগাড়ীর পাখা (Signal) যে তার দিয়ে উঠানো ও নামানো হয়, সে তার যদি হঠাৎ কেটে যায় তবে পাখা কোন্ অবস্থায় থাকবে ?	
২৮। কে অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ করে নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন ?	
২৯। বাঙালী সমাজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বাঙালীর লেখা কোন্ গ্রন্থ সবচেয়ে আধুনিক ও প্রশংসিত ?	
৩০। সেলাইএর কলের ছুঁচ কিরূপ হয় ও কি ভাবে লাগানো থাকে ?	

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective Test)

সপ্তম শ্রেণী

বিষয়—বাংলা কবিতা

বিষয়বস্তু—রসাল ও স্বর্ণলতিকা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

ছাত্রের নাম ....**বয়স**...............

শ্রেণী..............**বিদ্যালয়ের নাম**........... ......**তারিখ**.........

সময়..... ....**পূর্ণমান** ....

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন গুচ্ছাকারে দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। নির্দ্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে এবং বুঝিয়া উত্তর দিবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছের প্রয়োজনবোধে নমুনা দেওয়া আছে।

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইয়াছে ; তাহাদের উত্তর দেওয়া আছে—যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে। মনে রাখিবে যে, মাত্র একটি শব্দের নীচে দাগ দিতে হইবে।

নমুনা—ছাত্র কাহার নিকট পড়াশুনা করিয়া থাকে ?

সম্ভাব্য উত্তর :—পিতা, শিক্ষক, পুরোহিত, রাজকর্ম্মচারী।

[এখানে প্রশ্নটিতে ছাত্রের পড়াশুনার কথা আছে—কাজেই 'শিক্ষক' কথাটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইবে। অতএব 'শিক্ষক' কথাটির নীচে দাগ দেওয়া হইল।]

প্রশ্ন	উত্তর
১। কোন্ গাছের ফল খাইতে অম্ল অথচ মধুর ?	কাঁঠাল, জাম, রসাল, বট
২। কোন্ লতা দেখিতে উজ্জ্বল অথচ অত্যন্ত নরম ?	লাউ, কুমড়া, স্বর্ণলতা, শশা।
৩। দক্ষিণ দিক হইতে যে বাতাস বহে তাহাকে সাধারণতঃ কি বলে ?	হিমেল, মৌসুমী, আয়ন, মলয়।
৪। 'প্রবল ঝড়' শব্দটিকে সাধু ভাষায় কি বলা হয় ?	অনিল, সমীর, সমীরণ, প্রভঞ্জন।
৫। 'তপন' বলিতে কি বুঝ ?	চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, উপগ্রহ।
৬। 'সমর' শব্দটির অর্থ বুঝানো যায় কোন্ শব্দটির দ্বারা ?	ক্রীড়া, যুদ্ধ, বিরাম, উপভোগ।
৭। দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তীর নাম কি ?	উচ্চৈঃশ্রবা, চৈতক, ঐরাবত।

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে ; শূন্যস্থানগুলিতে এরূপ শব্দ বসাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়।

নমুনা—সূর্য্য উদিত হয়। সম্ভাব্য উত্তর—সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, রাত্রিকালে।

[এখানে 'সূর্য্যোদয়ের' কথা বলা আছে—সুতরাং যে সময়ে সূর্য্যোদয় হয় তাহা প্রভাতকাল। অতএব শূন্যস্থানে 'প্রভাতে' কথাটি বসিবে।]

প্রশ্ন	উত্তর
১। —বহিলে ও স্বর্ণলতিকা নতশিরা হয়।	ঝটিকা, প্রভঞ্জন, মলয়, সূর্য্য, হিমানী।
২। রসাল—মত তপ্ত সূর্য্যকিরণকে গ্রাহ্য করে না।	হিমাদ্রির, চন্দনের, অরুণের, কালাগ্নির, বরুণের।
৩। রাজার কাজ দুর্ব্বলকে—করা।	প্রতারণা, শাসন, পালন, নিমন্ত্রণ, হত্যা।
৪। পাখীরা গাছের—বাসা বাঁধে।	মূলে, কাণ্ডে, শাখায়, পাতায়।
৫। —করিয়া প্রবল ঝড় উঠে।	আনন্দ, দুঃখ, গর্জ্জন, চিন্তা, সম্মান।

তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে। এই শব্দগুলির ডান দিকে সেইভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো আছে এবং ডানদিকের শব্দগুলির পাশে "( )" ভাবে চিহ্ন দেওয়া আছে। বাম দিক্‌কার যে শব্দটির সঙ্গে ডান দিক্‌কার যে শব্দটির অর্থের দিক্ দিয়া মিল আছে—ডান দিক্‌কার শব্দটির পাশের শূন্যস্থানে বাম দিক্‌কার শব্দটির **ক্রমিক নম্বরটি মাত্র** বসাইবে।

নমুনা—

১। বঙ্গদেশ	কটক ( )
২। উড়িষ্যা	কলিকাতা ( )

[বঙ্গদেশের রাজধানী "কলিকাতা" এবং উড়িষ্যার রাজধানী "কটক"—সুতরাং বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং উড়িষ্যা ও কটক—"দেশ এবং রাজধানী" সম্বন্ধযুক্ত ; সুতরাং "কলিকাতার" পাশের "( )" চিহ্নিত স্থানে বঙ্গদেশের ক্রমিক সংখ্যা (১) এবং "কটক" শব্দটির পাশের "( )" চিহ্নিত স্থানে উড়িষ্যার

ক্রমিক সংখ্যা (২) বসাইতে হইবে।—অতএব পূর্ণ উত্তর হইবে ঃ—কলিকাতা (১), কটক (২)]।

১। নীরবিলা	দন্ত ( )
২। শীতলিয়া	চন্দ্রাননা ( )
৩। তাপন	আলয় ( )
৪। অনুক্ষণ	ক্ষীণদেহী ( )
৫। ভরাই	নৈপুণ্যে ( )
৬। বিধুমুখী	সর্ব্বদা ( )
৭। দর্প	চুপ করিল ( )
৮। কৌশলে	ভয় করি ( )
৯। ডেঁই	সুন্দরী স্ত্রী ( )
১০। আগার	শব্দ ( )
১১। স্বনন	ঠাণ্ডা হইয়া ( )
১২। ধনি	ভোগ করে ( )
১৩। ক্ষুদ্রকায়া	কিরণ ( )
১৪। ভুঞ্জে	সেইজন্য ( )

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেওয়া আছে ; যে উত্তরটি ঠিক উত্তর বলিয়া মনে করিবে—সেই উত্তরটির নীচে দাগ দিবে।

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ—

১। "শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !"

এখানে রসাল স্বর্ণলতিকাকে বলিতেছে, "তুমি সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা কর"—কারণ,

(ক) সৃষ্টিকর্ত্তা বড় করুণ।

(খ) সৃষ্টিকর্ত্তা বড় কৃপণ।

(গ) সৃষ্টিকর্ত্তা বড় নিষ্ঠুর।

২। হিমাদ্রিসদৃশ আমি,
বনবৃক্ষকুল স্বামী—,"—

এখানে রসাল নিজেকে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের সহিত তুলনা করিতেছে,—কারণ

(ক) সে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ গ্রাহ্য করে না।
(খ) বহু পাখী তাহার আশ্রয়ে বাস করে।
(গ) যে নিজে নানাভাবে জগতের উপকার সাধন করে।

৩। "হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে"—
আম গাছটি মাটিতে পড়িয়া গেল, কারণ

(ক) অনেক পাখী সেখানে বাস করিত এবং অনেক পাকা ফল সেখানে ছিল।
(খ) প্রবল বেগে ঝড় বহিয়াছিল।
(গ) আম গাছের খুবই অহঙ্কার ছিল।

পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেওয়া আছে; যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে সেই উত্তরটির নীচে দাগ দিবে।

(ক) কবি-পরিচিতি

১। কবি মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন—

(ক) বর্দ্ধমান জেলায়।
(খ) যশোহর জেলায়।
(গ) বীরভূম জেলায়।
(ঘ) চব্বিশ পরগণা জেলায়

২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রহণ করেন—

(ক) হিন্দু ধর্ম্ম, (খ) বৌদ্ধ ধর্ম্ম, (গ) খৃষ্টান ধর্ম্ম, (ঘ) ইস্‌লাম ধর্ম্ম।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি আছে—

(ক) ইংলণ্ডে, (খ) কলিকাতায়, (গ) মাদ্রাজে।

ষষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নের প্রশ্নটির সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে—যে উত্তরটি তোমার ঠিক বলিয়া মনে হইবে তাহার নীচে দাগ দিবে ঃ—

"রসাল ও স্বর্ণলতিকা" কবিতাটি পড়িয়া জানিতে পারা যায় ঃ—

১। কাহারও ভাল করিতে নাই।

২। ঝড়ের মুখে আম গাছ টিকিয়া থাকিতে পারে না।

৩। যদি বড় হও তাহা হইলে ছোটকে কখনও ঘৃণা করিও না।

সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ

নীচের অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের রচিত "রসাল ও স্বর্ণলতিকা" কবিতায় যেভাবে পড়িয়াছ সেইভাবে সাজাইয়া লিখ ঃ—

নীরবিলা-তরুরাজ ; গগনে উড়িল
সিংহনাদ করি ঘন,
আইলেন প্রভঞ্জন,
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।

সপ্তম শ্রেণী

বিষয় ঃ—বাংলা গম্ভ

বিষয়বস্তু—রুইদাস

ছাত্রের নাম................................বয়স.....................

শ্রেণী...............বিম্ভালয়ের নাম...........................তারিখ..........

সময়......................................পূর্ণমান........................

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন গুচ্ছাকারে দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত তাহার সমাধানের সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। নির্দ্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে এবং বুঝিয়া উত্তর দিবে। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনমত প্রশ্নগুচ্ছের সহিত নমুনা দেওয়া আছে।

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া আছে, তাহাদের সম্ভাব্য উত্তরগুলি পাশে দেওয়া আছে। উত্তরগুলির মধ্য হইতে যে শব্দটি ঠিক উত্তর বলিয়া মনে করিবে তাহার নীচে দাগ দিবে। মনে রাখিবে যে **একটি শব্দের নীচে** দাগ দিতে হইবে।

নমুনা ঃ—শিশু কাহার নিকট হইতে অধিক যত্ন পায় ?

সম্ভাব্য উত্তর ঃ—পিতার, বন্ধুর, <u>মাতার</u>, শিক্ষকের, ভ্রাতার।

[এখানে প্রশ্নটিতে শিশুর যত্নের কথা দেওয়া আছে। অসহায় শিশুর নিকট "মাতার" স্নেহই সমধিক। অতএব এখানে "মাতার"—এই কথাটির নীচে দাগ দেওয়া হইল।]

প্রশ্ন	উত্তর
১। জুতা প্রস্তুত করে কাহারা?	জেলেরা, স্বর্ণকারেরা, মুচিরা, সূত্রধরেরা, কর্ম্মকারেরা।
২। একদিন রুইদাসের ঘরে কে আসিলেন?	রাজা, মন্ত্রী, চোর, সাধু, ব্যবসায়ী।
৩। "ভৈরবী" শব্দটির প্রতিশব্দ কি?	শান্তিময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, ভয়ঙ্করী, সুন্দরী।
৪। রুইদাস কোথায় বাস করিত?	প্রাসাদে, আশ্রমে, কুটীরে, মন্দিরে।
৫। রুইদাস সাধুকে কি করিল?	বিদায় করিল, প্রণাম করিল, আশীর্ব্বাদ করিল, তিরস্কার করিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে ; শূন্যস্থানগুলিতে এরূপ শব্দ বসাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়।

নমুনা ঃ—আম পাকে।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ—শীতকালে, হেমন্তকালে, রাত্রিকালে, গ্রীষ্মকালে, প্রাতঃকালে।

[এখানে "আম পাকার" কথা বলা হইয়াছে—সুতরাং দেখা যায় সাধারণতঃ "গ্রীষ্মকালে" আম পাকে। অতএব শূন্যস্থানে "গ্রীষ্মকালে" কথাটি বসিবে।]

প্রশ্ন	উত্তর
১। রুইদাসকে—বলিয়া লোকে গালি দেয়।	ধনী, বিদ্বান্, দরিদ্র, অশুচি, শক্তিশালী।
২। রুইদাসের দুঃখ দেখিয়া সাধুর মনে—হইল।	ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ, করুণা, ক্রোধ।
৩। আমি তোমার সেবায়—হইয়াছি।	দুঃখিত, বিরক্ত, পরিতৃপ্ত, লজ্জিত।
৪। প্রভুর নিকট হইতে অন্য বর—করি না।	দাবী, প্রার্থনা, অঙ্গীকার, প্রত্যাখ্যান।
৫। তোমার ধর্ম্মে—হউক।	বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, মতি, লোভ, বৈরাগ্য।

তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে। সেই শব্দগুলির ডান দিকে কতকগুলি শব্দ সেইভাবে বসানো আছে। ডানদিকের শব্দগুলির ঠিক পাশে "( )" চিহ্ন দেওয়া একটি করিয়া জায়গা আছে। বাম দিক্‌কার যে শব্দটির সঙ্গে ডান দিক্‌কার যে শব্দটির অর্থের মিল থাকিবে ডান দিক্‌কার সেই শব্দটির পাশের শূন্যস্থানে বাম দিক্‌কার শব্দটির ক্রমিক **নম্বরটি মাত্র** বসাইয়া দিবে।

নমুনা :—

১। বঙ্গদেশ	
২। বিহার	পাটনা ( )
	কলিকাতা ( )

["বঙ্গদেশের" রাজধানী "কলিকাতা" এবং "বিহারের" রাজধানী "পাটনা", সুতরাং বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং বিহার ও পাটনা "দেশ এবং রাজধানী" সম্বন্ধযুক্ত ; সুতরাং "কলিকাতা"র পাশের "( )" চিহ্নিত স্থানে বঙ্গদেশের ক্রমিক সংখ্যা (১) বসিবে এবং "বিহার" শব্দটির পাশের "( )" চিহ্নিত স্থানে বিহারের ক্রমিক সংখ্যা (২) বসাইতে হইবে—অতএব পূর্ণ উত্তরটি হইবে এইরূপ :—কলিকাতা (১), বিহার (২)।]

১। যথাশক্তি	করুণা ( )	৯। ঘুচিল	জানিবে ( )
২। ব্যথিত	অনটনে ( )	১০। বুঝিবে	দুঃখিত ( )
৩। মোচন	ক্ষতি ( )	১১। পুনরায়	নির্ম্মল ( )
৪। স্বর্ণ	কাপড় ( )	১২। বস্ত্র	ছাড়া ( )
৫। মূল্য	আবার ( )	১৩। অভাবে	দূর হইল ( )
৬। বিমল	শূন্য ( )	১৪। অনিষ্ট	দাম ( )
৭। ব্যতীত	দূর ( )	১৫। কৃপা	সোনা ( )
৮। রিক্ত	সাধ্যমত ( )		

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ

নীচে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেওয়া আছে; যে উত্তরটি ঠিক উত্তর বলিয়া মনে করিবে—সেই উত্তরটির নীচে দাগ দিবে।

(১) রুইদাস কোন বৈষ্ণবের গৃহে প্রবেশ করে না……কারণ

(ক) সে ধনী।

(খ) সে দাম্ভিক।

(গ) সে অস্পৃশ্য।

(২) সাধু ভাবিলেন—রুইদাস তখন স্পর্শমণির মূল্য বুঝিবে সে যখন

(ক) বিলাসী হইবে।

(খ) অভাবে পড়িবে।

(গ) বড় হইবে।

(৩) রঘুবর ছিলেন :—

(ক) যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা।

(খ) দশরথের পুত্র।

(গ) রাবণের বন্ধু।

(৪) স্পর্শমণির স্পর্শে—

(ক) তামা রূপা হয়।

(খ) হীরা কয়লা হয়।

(গ) লোহা সোনা হয়।

(ঘ) পারদ সীসা হয়।

পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নের যে কথাটি তোমার ভাল লাগিবে তাহার নীচে দাগ দিবে :—

(১) অভাবে পড়িলেই যে স্পর্শমণির মূল্য বুঝিবে।

(২) সাধুর বেশ ধরিয়া কে আমার এই অনিষ্ট করিতে আসিল?

(৩) প্রভু, দুঃখ ঘুচিলে যে দুঃখের ঠাকুরকে হারাইব।

ষষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ

নিম্নের প্রশ্নটির সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে, যে উত্তরটি তোমার ঠিক বলিয়া মনে হইবে তাহার নীচে দাগ দিবে :—

"রুইদাস" গল্পটি পড়িয়া জানিতে পারা যায় :—

(১) যদি রুইদাস স্পর্শমণিটি লইত তাহা হইলে

(ক) তাহার মনে শান্তি থাকিত।

(খ) সে প্রাণের ঠাকুরকে হারাইত।

(গ) সে পরম সুখে বাস করিত।

সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ

নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে তাহাদিগকে এমনভাবে দুই সারিতে সাজাও যাহাতে বাম সারিতে যে শব্দটি বসিবে তাহার বিপরীত অর্থবোধক শব্দটি ঠিক ডান দিকের সারিতে বসিবে।

গ্রীষ্ম, উত্থান, আনন্দ, বৃদ্ধি, জন্ম, পতন, দুঃখ, শীত, ক্ষয়, মৃত্যু।

অষ্টম প্রশ্নগুচ্ছ

নীচে বাম দিকে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজানো আছে ; তাহাদের প্রত্যেকের ডানদিকে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে—এইগুলির মধ্য হইতে যে শব্দটি বামদিকের শব্দটির সমান অর্থ বুঝাইবে তাহার নীচে দাগ দিবে।

অনিল—	শব্দ, বায়ু, জল, বিস্ময়।
অদ্রি—	গৌরব, আনন্দ, পর্ব্বত, সূর্য্য।
গগন—	পাতাল, আকাশ, নগর, রথ।

নবম প্রশ্নগুচ্ছ

নীচে কতকগুরি শব্দ দুই সারিতে সাজানো আছে ; বাম সারিতে যে শব্দটি দেওয়া আছে তাহার বিপরীত লিঙ্গবোধক শব্দটি ঠিক তাহার ডানদিকে বসাইয়া দাও। মনে রাখিবে যে যে শব্দগুলি দেওয়া আছে তাহাদের মধ্য হইতেই সাজাইতে হইবে।

সুন্দর— স্ত্রী— বালক— আয়া— পুরুষ— বিবি—

সাহেব— বালিকা— গোলাম— সুন্দরী—

নবম শ্রেণী

বিষয় ঃ—ভূগোল (এশিয়ায় ভৌগোলিক পরিবেশ)

১। যেটি ঠিক উত্তর তার নীচে দাগ দাও ঃ—

(ক) আসামের ডিগবয়ে কয়লা, লৌহ, খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

(খ) মাদ্রাজের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য মাছ, রুটি, ভাত ফল।

(গ) উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়।

(ঘ) 'কুরোশিয়ো স্রোত' কানাডার পূর্ব্ব উপকূল বাহিয়া, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া, জাপানের পূর্ব্ব-উপকূল বাহিয়া প্রবাহিত হয়।

২। বামদিকের কোন্ অঞ্চলে ডানদিকের কোন প্রাণী অধিক বাস করে তাহা ডানদিকের নামের পাশের সংখ্যা লিখে প্রকাশ কর ঃ—

(ক) মরু অঞ্চলে—গরু ও মহিষ (১)

(খ) মৌসুমী অঞ্চলে—উটপাখী ও উট (২)

(গ) ভূমিধ্যসাগরীয় অঞ্চলে—জলহস্তী ও কুমীর (৩)

(ঘ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে—নেকড়ে বাঘ ও গাধা (৪)

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) কাশ্মীরের রাজধানী —

(খ) সর্ব্বোচ্চ মালভূমি — কে পৃথিবীর — বলা হয়।

(গ) জাভাদ্বীপে অধিক পরিমাণে — উৎপন্ন হয়।

(ঘ) জাকার্ত্তা — রাজধানী।

(ঙ) নর্ম্মদা নদী — সাগরে পতিত হইয়াছে।

(চ) সান্তাক্রুজ — বিমান বন্দর।

৪। নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহার পার্শ্বে (√) চিহ্ন দাও এবং ভুলগুলির পাশে (×) চিহ্ন দাও ও শুদ্ধ উত্তর লিখ :—

(ক) তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর।

(খ) কাশীতে রেল ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

(গ) মালয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রবার আমদানি করে।

(ঘ) ফুজিয়ামা পর্ব্বত মাদ্রাজে অবস্থিত।

(ঙ) সী নদীর মোহনায় হংকং দ্বীপ অবস্থিত।

(চ) নেপাল একটি পরাধীন রাষ্ট্র।

৫। যেটি সঠিক উত্তর তাহাকে পার্শ্বের বন্ধনীর মধ্যে লিখ :—

(ক) উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল ও কঠিন হইবার সময় প্রথমেই যে সকল শিলা দিয়া গঠিত হয় তাহাদিগকে—পাললিক শিলা, রূপান্তরিত শিলা, আগ্নেয় শিলা বলে। (   )

(খ) পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন্ স্থান হইতে একটি ব্যাস টানিলে সেই ব্যাসটির অপর প্রান্ত যে স্থানে ভূপৃষ্ঠকে স্পর্শ করে, সেইস্থানকে উক্তস্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ, প্রতিপদ স্থান বলে। (   )

(গ) ভারতের রাজধানীর দ্রাঘিমা—৮৮°৩০′ পূঃ, ৮২°৩০′ পূঃ, ১১০°২৪′ পঃ। (   )

(ঘ) ঋতু পরিবর্ত্তন হয়—আহ্নিক গতির, বৃষ্টির, বার্ষিক গতির, ঝড়ের ফলে। (   )

৬। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সত্য হইলে পার্শ্বে চিহ্নিত দাগের নীচে 'হাঁ' লিখ এবং মিথ্যা হইলে 'না' লিখ :—

(ক) ওপাখা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত—

(খ) ময়ুরাক্ষী বাঁধ পরিকল্পনায় পাঞ্জাব বিশেষ উপকৃত হইয়াছে—

(গ) ভারতের উত্তোলিত স্বর্ণের প্রায় সমস্তই কোলার স্বর্ণখনিতে পাওয়া যায়—

(ঘ) পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য গম—

(ঙ) সাংহাই চীনের সর্ব্বপ্রধান বন্দর—

৭। প্রশ্নের পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ :—

(ক) সবচেয়ে বেশী লোক পৃথিবীর কোন্ দেশে বাস করে ?

(খ) কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' বলে ?

(গ) হীরাকুন্দ বাঁধ ভারতের কোন্ প্রদেশে ?

(ঘ) এশিয়ার মধ্যে কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী ভূমিকম্প হয় ?

(ঙ) পৃথিবীর মধ্যে শীতলতম স্থান কোন্‌টি ?

(চ) জাপান কোন্ দ্রাঘিমায় অবস্থিত ?

৮। নিম্নে বামদিকের শ্রেণীতে কতকগুলি নাম দেওয়া হয়েছে এবং ডানদিকের শ্রেণীতে তাদের কোন্‌টি কি জন্য বিখ্যাত তাহা এলোমেলোভাবে লেখা রয়েছে এবং তাদের পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি লেখা রয়েছে। এখন বামদিকের শ্রেণীর কোন স্থানটি কেন বিখ্যাত তাহা ঐ নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি লিখে প্রকাশ কর।

উদাহরণ :—

(ক) দার্জ্জিলিং—ভারতের লৌহশিল্পের কেন্দ্র (১)

(খ) আমেদাবাদ—পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস (২)

(গ) জামসেদপুর—বস্ত্রশিল্পের একটি কেন্দ্র (৩)

উত্তর :—

দার্জ্জিলিং—(২)
আমেদাবাদ—(৩)
জামসেদপুর—(১)

এখন নিম্নলিখিতগুলির উত্তর দাও :—

(ক) ভিলাই—জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ (১)

(খ) পাঁচমারী—একটি নবগঠিত ইস্পাত-নির্মাণ-কেন্দ্র (২)

(গ) বিশাখাপত্তনম্—একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৩)

বিষয়-সংকেত

পুস্তকের নির্ঘণ্ট

১। Psychology in Education—Sorenson H.

২। Psychology and its Bearing on Education—Valentine C.H.

৩। Child Psychology—Jersild A. T.

৪। Personality & Psychological Interpretation—Allport G.

৫। Measurement of Abilities—Vernon P. E.

৬। Practical Guidance Method—Knapp R. H.

৭। You and your Retarded Child—S. A. Knock.